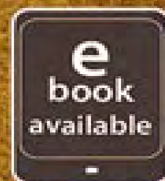


অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

দেশনায়কের পথে

আজাদ হিন্দ ফৌজের যাত্রাপথে
সিঙ্গাপুর থেকে মণিপুর

দেশনায়কের পথে

আজাদ হিন্দ ফৌজের যাত্রাপথে সিঙ্গাপুর থেকে মণিপুর

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়



প্রথম সংস্করণ: মে ২০২১
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২১

ISBN 9789354250866 (print)
ISBN 9789354250941 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: সৌরীশ মিত্র

কৃষ্ণা বসুর স্মৃতির উদ্দেশে

আমার মতো এক সমাজ-বহির্ভূত বাউন্ডুলের, এমন মানুষের সংস্পর্শে আসার কথা কোনওদিনই ছিল না। কিন্তু এমনটা সত্যিই ঘটেছিল এবং মূলত তাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণাতেই আজ *দেশনায়কের পথে* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

প্রাক্‌কথন

সুভাষচন্দ্র বসু 'মা' বাসন্তীদেবীকে মান্দালয় জেল থেকে ১৯২০-এর ৩০ ডিসেম্বর লিখেছিলেন, 'আমি আমার জীবনটাকে একটা adventure বলেই গ্রহণ করছি— জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ভগবানের হাতে।' নেতাজির adventure-ময় জীবনের অবশ্য একটাই উদ্দেশ্য ছিল— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। *দেশনায়কের পথে* গ্রন্থের লেখক অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় adventure ভালবাসেন। তাঁর প্রিয় adventure পর্বতারোহণ। তবে এই বইয়ে তিনি এক ভিন্ন স্বাদের রোমাঞ্চকর কাহিনি বিবৃত করেছেন। দেশের মুক্তির গিরিশৃঙ্গে পৌঁছতে নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ যে দুর্গম পথে যাত্রী হয়েছিলেন, সেই পথ অনুসরণ করে লেখক চয়ন করে এনেছেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমূল্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ।

সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত হিলাল আকারের ভূখণ্ডটি ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাগুলির সাক্ষী। বিমানযোগে কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর পৌঁছতে লেখকের লেগেছিল ঠিক চার ঘণ্টা। নেতাজি এসেছিলেন আরও অনেক ঘুরপথে, সময়ও লেগেছিল অনেক বেশি। কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ১৯৪১-এর ১৬-১৭ জানুয়ারি রাত্রের মহানিষ্ক্রমণ দিয়ে সেই যাত্রার শুরু। শিশিরকুমার বসু তাঁর রাঙাকাকাবাবুকে পৌঁছে দিয়ে এলেন গোমো অবধি তাঁর wanderer গাড়ি করে। সেখান থেকে মহম্মদ জিয়াউদ্দিন চললেন একাকী দিল্লি হয়ে পেশওয়ার। মিয়া আকবর শাহ্-এর ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথের দেশনায়ক পৌঁছলেন কাবুল। সেখানে নাম ও বেশ বদল করে Orlando Mazzotta-র পরবর্তী সফর সোভিয়েত রাশিয়া হয়ে জার্মানি।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানের সিঙ্গাপুর দখলের সময় থেকেই নেতাজি এশিয়া আসার জন্য উদগ্রীব। এই যাত্রার ব্যবস্থা করতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘ নব্বই দিনে ডুবোজাহাজে বিপদসংকুল সমুদ্রপথে তিনি ইউরোপ থেকে এশিয়া এসে পৌঁছলেন। এর মধ্যে ছিল মাঝসমুদ্রে জার্মান ডুবোজাহাজ থেকে জাপানি ডুবোজাহাজে স্থানান্তর। জাপানি উ-বোট নেতাজি ও তাঁর সঙ্গী আবিদ হাসানকে নিয়ে এল সুমাত্রার সাবাং বন্দরে। সেখান থেকে উড়োজাহাজে টোকিও, আবার সেখান থেকে ১৯৪৩-এর ২ জুলাই নেতাজির সিঙ্গাপুরে আগমন। গান গেয়ে তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানো হল— মুমতাজ হুসেনের ভাষায় 'এশিয়া কে আফতাব'— 'এশিয়ার আলো'— এবার এশিয়া এসে পৌঁছেছেন। অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন যে নেতাজি তাঁর নিজের হাতে লিখেছেন জুলাই ১৯৪৩-এ তাঁর কাজ শুরু— 'Began work'। ইতিহাসমণ্ডিত সিঙ্গাপুর শহরে লেখকের যাত্রা শুরু।

ভ্রমণ ও ইতিহাসের মেলবন্ধনে সাহিত্য রচনার অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন কৃষ্ণা বসু। ১৯৭১-এ তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে *ইতিহাসের সন্ধানে*। আর ১৯৭৯-তে তাঁর জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়া সফরের ফসল *চরণরেখা তব*। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নেতাজির কীর্তির বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই দুটি বই অবশ্যপাঠ্য। *দেশনায়কের পথে*-র লেখক কৃষ্ণা বসুর *চরণরেখা তব* হাতে নিয়েই নেতাজির পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই এতদিনে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তবে এখনও সেই আন্দোলনের এবং বিশেষত ঝাঁসি রানি রেজিমেন্টের সেনানীদের কেউ কেউ বেঁচে আছেন। লেখক তাঁদের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। তা ছাড়া এখনও রোমাঞ্চিত করে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন বা মান্দালয়ের কোনও কোনও বিশেষ জায়গার স্থানমাহাত্ম্য। লেখক তাঁর ভ্রমণের প্রথমদিনেই পৌঁছে গেছেন সিঙ্গাপুরের ক্যাথে থিয়েটারে, যেখানে ১৯৪৩-এর ৪ জুলাই নেতাজি এশিয়ায় ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আবার ২১ অক্টোবর সেখানেই আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। ১৯৪৩ নেতাজির জীবনে এক অত্যাশ্চর্য বছর, যার গোড়ায় তিনি ছিলেন ইউরোপে। বছর শেষ হওয়ার আগেই তিনি পা রেখেছিলেন আন্দামানের দ্বীপপুঞ্জে। বর্মা থেকে তিনি চেষ্টা করেছিলেন দুর্ভিক্ষকবলিত বাংলায় চাল পাঠাতে। নিষ্ঠুর ইংরেজ সরকার তা কিছুতেই হতে দেয়নি।

নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গেই যেন লেখক এগিয়ে চলেছেন মালয়, শ্যামদেশ ও বর্মা হয়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। দেশে প্রবেশের ঐতিহাসিক মুহূর্তে নেতাজি এক অবিস্মরণীয় Order of the Day রচনা করেছিলেন: 'ঐ দূরে— ঐ নদী পেরিয়ে, ঐ সব জঙ্গল পার হয়ে, ঐ পর্বতমালার ঐ পারে রয়েছে সেই স্বপ্নের দেশ— যে মাটিতে আমরা জন্ম নিয়েছি— যে মাটিতে আবার আমরা ফিরতে চলেছি।'

'চলো দিল্লি' সংকল্পের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাক্ষী ইম্ফল, কোহিমা ও বর্মার প্রকৃতি ও মানুষ। যে টামু-মোরে সীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ ফৌজ তেরঙ্গা পতাকা দেশের মাটিতে স্থাপন করেছিলেন, সে-পথেই লেখক দেশে ফিরলেন। নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক পরাজয় রাজনৈতিক জয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল ১৯৪৫-এর শেষে লাল কেল্লায় আইএনএ বিচারের সময়। নেতাজির ইচ্ছে ছিল যে যখন তাঁর আজাদি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সেনানী কলকাতা প্রবেশ করবে তখন তাদের নেতৃত্বে থাকবে ঝাঁসি রানি রেজিমেন্ট। সেই স্বপ্ন পূরণ না হলেও আজও অনুপ্রেরণা জোগায়। নেতাজি তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন হিন্দু-মুসলমান-শিখ-ইসাহী, পঞ্জাবি-তামিল-মরাঠি-বাঙালি, পুরুষ-মহিলা, ঐক্য ও সাম্যের নজির যা কখনও ভোলার নয়।

লেখক অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায় নিজেকে ভবঘুরে আখ্যা দিয়েছেন। ভবঘুরেমির শাস্ত্রে পূর্ণ আস্থা না থাকলেও, তিনি ভবঘুরেমির আদর্শে বিশ্বাসী। *দেশনায়কের পথে* তাঁর এই adventure-কাহিনি প্রমাণ করে যে তাঁর ভবঘুরেমি সার্থক হয়েছে।

সুগত বসু

নভেম্বর ২০২০, কেমব্রিজ

সূচি

‘One should strive to combine the maximum of impatience with the maximum of skepticism, the maximum of hatred of injustice and irrationality with the maximum of ironic self-criticism. This would mean really deciding to learn from history rather than invoking or sloganizing it.’

—Christopher Hitchens, *Letters to a Young Contrarian*

প্রস্তাবনা

১

গোস্বামী তুলসীদাসকে উদ্ধৃত করে *ভবঘুরে শাস্ত্র* বইতে রাহুল সাংকৃত্যায়ন লিখেছিলেন: ‘আজ পৃথিবীতে এমন ভবঘুরের দরকার যিনি তাঁর ভ্রমণকে কেবল “স্বান্তঃ সুখায়” স্তরে আবদ্ধ রাখবেন না। তাঁকে মনে রাখতে হবে, সব জিনিসকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখবেন, ঘরে বসে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষও যেন সেরকম দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন।’ আবার সেই শাস্ত্রেরই একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় রাহুলজি লিখেছিলেন, ‘ভবঘুরে শাস্ত্রের চেয়ে ভবঘুরেমির আদর্শ অনেক পুরনো।’ ভবঘুরেমির ছাত্র হবার পর থেকে আমার নিজেরও বারবার মনে হয়েছে আদর্শটাই বড় কথা, ‘শাস্ত্র’ বললেই কেমন যেন সিলেবাস এবং প্রশ্নপত্র গোছের শোনায়। মনে হয়, বেঁচে থাকার তাগিদে এক সমাজের সিলেবাস মেনে চলতে গিয়েই প্রাণ ওষ্ঠাগত, তায় ভবঘুরেমিকেও যদি ডু’জ় অ্যান্ড ডোন্ট’জ়-এ বেঁধে এক ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে হয়; তা হলে তো এন্ডগেম আসন্ন!

আধুনিক মানুষ মনেটারি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হল অর্থোপার্জন। সেই গড্ডলিকার প্রবাহে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটে চলা কোনও ধর্মসংকটের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকলেও, বাস্তব জীবনে তার অস্তিত্বের অবকাশ নেই। তার চিন্তার স্তরে সর পড়ার মতো এই একটাই স্তর বেশ পুরু হয়ে জমে গেছে— অর্থোপার্জন, এবং আরও অর্থোপার্জন এবং তারপর আরও। মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক অবক্ষয় এইসব কথাগুলো কেবল সুবিধামতো ব্যবহার করার জন্য রয়ে গেছে। মনুষ্যত্ব হেরে গেছে অনেক দিনই, জিতে গেছে দেখেও না দেখতে পাওয়ার খেলা। সমাজের সিলেবাস বলছে মুখস্থ করো টাকা রোজগারের সাজেশন বই, আর সময়মতো তা উগরে দাও। যারা পারবে না তারা লুজ়ার— হেরো পার্টি। এদিকে বিশ্বের এক বিরাট সংখ্যক বিজ্ঞানীদের অভিমত হল আজকের বিশ্বে একটা মাস এক্সটিঙ্কশন— প্রাণীজগতে একটা গণবিলুপ্তি আসন্ন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় বারোটি করে প্রাণীর প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ নামের একটি মাত্র প্রজাতির তথাকথিত ‘সভ্যতা’র ‘অগ্রসরের’ কল্যাণে। তাই মনে হয়, মানুষ নামের এই প্রাণীর অর্থনৈতিক দর্শন একেবারেই নিরর্থক না হলেও পৃথিবীর বুকে যে অনর্থ ডেকে এনেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর তাই যদি হয়, তা হলে রসায়নশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রের মতো ফর্মুলায় ভবঘুরেমিকেও নাই-বা বেঁধে ফেলা হল, থিয়োরি এবং থিয়োরেমের গুরুপাক বদহজমে। কারণ, আমার মনে হয়, যাকে শাস্ত্র পড়ে ভবঘুরেমি শিখতে হয়, তার দ্বারা আর যাই হোক, প্রথম, এমনকী দ্বিতীয় শ্রেণির ভবঘুরেমিও হবে না।

ভবঘুরে ঘর ছাড়ে নতুন কিছু জানার এক অদম্য কৌতূহলে। তার মানে এই নয় যে, সে তার ঘর, তার স্বজন, তার স্বদেশকে ভুলে যেতে চায়। জাত ভবঘুরেরা এসকেপিস্ট নয়। তাদের চোখ-কান খোলা থাকে

বাস্তবের রোজনামচায়, মগজে আনাগোনা করে কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আর হৃদয় জুড়ে থাকে মানুষকে চেনার, তাকে আরও ভালবাসার আগ্রহ। তাদের মনে এক অসম্ভব তাগিদ কাজ করে আবিষ্কারের বিস্ময় কাটিয়ে সত্যকে জানার এবং সুযোগ পেলেই সেই অভিজ্ঞতা আরও পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেবার। তাকে সেই দায়িত্ব কেউ দেয়নি, তবু একঝলক তাজা বাতাস একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে আনার জন্য সে সর্বদাই উদগ্রীব। বাইরের দুনিয়ার হাল-হকিকত আপনজনের কাছে নিভৃতে বসে ভাগ করে নেওয়াই তার একমাত্র স্বঘোষিত ধর্ম। তবে এই লেখার প্রারম্ভেই ভবঘুরেমির চরিত্র এবং শ্রেণিবিন্যাসে আর না জড়িয়ে পড়ে, আসুন, বরং সেই 'স্বান্তঃ সুখায়' ফিরে আসি। 'স্বান্তঃ সুখায়', অর্থাৎ, আপন মনের সুখের খোঁজে নিজের মাঝে মজে থাকার ঝোঁকেই একসময় আমারও পথ চলা শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল পর্বতারোহণের হাত ধরে। প্রথমদিকে অবশ্য কেবল বেরিয়ে পড়ার রোমান্টিসিজ়মটাই ছিল, আর ছিল অ্যাডভেঞ্চারের খিদে। দুঃসাহসিক, চ্যালেঞ্জিং কিছু করার মধ্যে একটা অপরিসীম পরিতৃপ্তি আমি পেতাম। সেই পরিতৃপ্তিকে আজ মনে হয় 'স্বান্তঃ সুখায়'— একধরনের ছেলেমানুষি আত্মমগ্নতা। ঠিক যেন 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও' যুগের যোগ্য স্লোগান। তাই সেই উপলব্ধি আজ আমাকে নিজের কাছে করে তোলে অল্প হলেও, হাস্যকর। ২০১২-তে আফ্রিকার অন্দরমহলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর থেকে আমি রাহুলজির কথা আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। তারপর থেকেই আমার ভবঘুরেমির মধ্যে সবসময়েই একটা মিনিংফুল এবং তাৎপর্যপূর্ণ কিছু করার তাগিদ কাজ করে। নিছক ব্যাকপ্যাকিং কিংবা কোনও একটা বিখ্যাত পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার মধ্যে ক্ষণিকের আনন্দ পেলেও, আর পরিতৃপ্তি পাই না। সেই অতৃপ্তি থেকেই সাইকেলে সাহারা মরুভূমি পার, চিনের ভুলে যাওয়া উপজাতি ব্ল্যাক লোলোদের সঙ্গে নিয়ে এক নতুন পর্বতমালার খোঁজ, কিংবা, শঙ্করের স্বপ্ন সফলের উদ্দেশ্যে চাঁদের পাহাড় আরোহণের মতো কাজের জন্ম হয়। তবু, কেন জানি না কেবলই মনে হয়, সময় ফুরিয়ে আসছে, এইবেলা কিছু কাজের কাজ করা দরকার। কারণ ভবঘুরেমির দর্শন এবং পন্থা নিতান্ত নিরর্থক নয়। ইবন বতুতা থেকে বিল ব্রাইসন, মার্ক টোয়েন থেকে এডোয়ার্ড অ্যাবে, মার্কো পোলো থেকে পল থেরু— আমার এই দাবির সপক্ষে এমন অনেক ভবঘুরের নাম আমি লিখে যেতে পারি যাঁদের ভ্রমণকাহিনি নিছক ট্রাভেলগ নয়— বরং মানুষের ইতিহাস পড়া এবং তাকে বোঝার এক একটি অমূল্য দলিল।

আমি তাই ভবঘুরেমির পন্থা বেছে নিলাম আরও একবার। ভাবলাম, যেহেতু এক কৌতূহলী পথিকের কাজটাই আমার দ্বারা হয়, তাই কেননা নিজেকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা যাক এইবার! নিজেকে নিয়ে ফেলা যাক মাত্র পঁচাত্তর বছর আগের এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। এমন এক ইতিহাস, যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের আধুনিক ভারতবর্ষের বুনিয়াদ। ফিরে দেখা যাক এমন একসময় যখন দলগত রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গর্জে উঠেছিল আমাদের দেশপ্রেম। আরও একবার কাছ থেকে দেখা যাক ভারতবর্ষের শেষ স্বাধীনতার যুদ্ধ— দি লাস্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। ছুঁয়ে আসা যাক এমন এক দুঃসাহসিক টাইমলাইন, যা হার মানাতে পারে যে-কোনও হলিউড থ্রিলার কিংবা অ্যাকশন মুভিকে। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং রাজসভার ঐতিহাসিকদের বদান্যতায়, সে এমন এক 'সময়' এবং তার 'নায়কের' কাহিনি, যাকে ঘিরে গড়া হয়েছে অহেতুক বিভ্রান্তির ঘেরাটোপ— একবার নয়, বারবার। এই সময়ের কেন্দ্রবিন্দু এমন এক চরিত্র যিনি নিজেই দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের একটি

সংজ্ঞা; আবার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কাছে একজন পথভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতা। এমন এক মানুষ, যাঁর জীবন এবং কাজের পর্যালোচনা ছেড়ে, কেবল মৃত্যু নিয়ে ভারতবাসীর রহস্যের জাল বোনার আগ্রহ অনেক বেশি, আজও।

২

নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় সত্যিই মারা গেছেন কিনা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে কেবল ভারতীয়রাই সচেষ্ট ছিলেন না। ব্রিটিশ, জাপানি এবং আমেরিকানরাও পৃথকভাবে বহুবার তাঁদের তদন্ত চালিয়েছিলেন। প্রত্যেকবারই তদন্তকারী ব্যক্তি কিংবা কমিশনগুলি একটিই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন— ১৮ আগস্ট ১৯৪৫, তাইহোকু এয়ার স্ট্রিপে, বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মক রকম জখম এবং গুরুতর ভাবে দগ্ধ হয়ে নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল। জ্বলন্ত, বিধ্বস্ত, ভেঙে পড়া বিমান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরিয়ে যখন নেতাজির মুখোমুখি হয়েছিলেন হাবিবুর রহমান, তখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল সেই মুখ তখন ‘ব্যাটার্ড বাই আয়রন, বার্ন্ট বাই ফায়ার’। সেই বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো একমাত্র হতভাগ্য ব্যক্তি ছিলেন না নেতাজি, যেমন ছিলেন না হাবিবুর রহমান একমাত্র বেঁচে থাকা সাক্ষী। সেই একই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগী জেনারেল সুনামাসা শিদেই-ও। জেনারেল শিদেই-এর পরিজনেরা কোনওদিন তাঁর মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। শাহনওয়াজ খান কমিটির সদস্যেরা জাপানে গিয়ে জেনারেল শিদেই-এর সার্ভিস রেকর্ডে দেখেছিলেন লেখা আছে— মৃত্যুর তারিখ ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫; মৃত্যুর স্থান— তাইহোকু এয়ার স্ট্রিপ; মৃত্যুর কারণ— ডেথ বাই ওয়ার। একজন সৈনিকের কাছে এর থেকে সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না। হাবিবুর রহমান ছাড়াও আরও ছ'জন জাপানি সহযাত্রী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই ছ'জন জাপানি সৈনিকের মধ্যে পাঁচজন— লেফটেন্যান্ট কর্নেল শিরো নোনোগাকি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাদেও সাকাই, মেজর তারো কোনো, ক্যাপ্টেন কেইকিচি আরাই এবং মেজর ইহাহো তাকাহাসিকে একাধিকবার ভারতের, ব্রিটেনের এবং জাপানের বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিশনের প্রতিনিধিরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাইহোকু এয়ার স্ট্রিপের গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং গ্রাউন্ড স্টাফেরা, যাঁরা সেই অভিশপ্ত ‘টুইন-ইঞ্জিন হেভি বম্বার অফ ৯৭/২ (স্যালি)’ মডেলের বিমানটিকে শেষবার দেখভাল করেছিলেন এবং বিমানটি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন— তাঁদেরও বয়ান নেওয়া হয়েছিল। নেতাজির জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টায় যাঁরা তাঁর প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, তাইপেই নানমোন মিলিটারি হাসপাতালের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সার্জেন ডা. ক্যাপ্টেন ইওশিমি তানেওশি, তাঁর সহকারী ডা. সুরুতা, এমনকী সেই চিনা নার্স সান পি শা-কেও খুঁজে বার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। নেতাজির মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন ইন্টারপ্রেটার নাকামুরা। নাকামুরা যখন হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন, তখনও নেতাজি কথা বলছেন। নাকামুরাকে নেতাজি বলেছিলেন, ‘আমার আরও কিছু লোক আমার পরেই ফরমোসা এসে পৌঁছবে। ওদের একটু দেখাশোনা করবেন।’ তার আধঘন্টা পরেই খোঁজ নিয়েছিলেন, জেনারেল শিদেই কোথায়? তার কিছু পরে, রাত ন'টা নাগাদ বলেছিলেন, ‘আমি একটু ঘুমোতে চাই।’ সেই নেতাজির শেষ কথা। নাকামুরা, মেজর নাগামোতো এবং হাবিবুর রহমানের উপস্থিতিতে নেতাজির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। নাকামুরা, নাগামোতোর বয়ানও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫

সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭৪ পর্যন্ত সময়ের বিস্তারে সেই ইন্টারভিউগুলি ঘটেছিল বিভিন্ন স্থানে এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে। এঁদের প্রত্যেকের বিবরণের সঙ্গে হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট হুবহু মিলে গিয়েছিল। সকলেই নিঃসংশয় ছিলেন বিমান দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে।

সকলেই, কিন্তু একজন ছাড়া। ফৈজাবাদের জনৈক গুমনামি বাবাই স্বয়ং নেতাজি— প্রথম থেকে এই কথা একরকম ঘোষণা করেই, ১৯৯৯ সালে আসরে নেমেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মনোজ মুখার্জি। শুরু হয়েছিল নেতাজি-মৃত্যু ‘রহস্যে’ আরও এক কমিশন। এবং রহস্য গল্প গিলে খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতই মুখার্জি কমিশন জনমানসে বেশ সাড়া ফেলেছিল। যথাসময়ে, মুখার্জি কমিশনের সুপারিশমতো, গুমনামি বাবা এবং বসু পরিবারের ডিএনএ পরীক্ষা করে তুলনা করা হয়েছিল। নেতাজির হাতের লেখার সঙ্গে গুমনামি বাবার হাতের লেখা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে মিলিয়ে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসবের কোনওটাই যখন মেলেনি, তখন কমিশন গঠনের সাত বছর পর এক বিচিত্র রিপোর্ট পেশ করেছিলেন মনোজবাবু। সেই রিপোর্টে উনি জানিয়েছিলেন, ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট, তাইহোকুতে নাকি কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ঘটেনি। অবশ্য, ২০১০-এর একটি ইন্টারভিউতে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে প্রথম থেকেই একটা পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়েই তিনি তাঁর কাজে নেমেছিলেন। বলাবাহুল্য, পার্লামেন্টে মুখার্জি কমিশনের সেই রিপোর্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এমনকী, আজ একথাও জানা গেছে যে, গুমনামি বাবার ছবি বলে সারাদেশের পত্র-পত্রিকায় যা এতদিন ছাপা হয়ে এসেছে, তা আসলে ফোটোশপের কারসাজি ছিল। একথা ঠিক যে, দেশ স্বাধীন হবার পর, প্রথম কয়েক দশক জুড়ে নেতাজির এইরকম মৃত্যু দেশের এক বড় অংশ স্বাভাবিকভাবেই অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি। এক না একদিন তাদের দেশনায়ক ঘরে ফিরবেন, এই বিশ্বাস অনেকদিন পর্যন্ত প্রবহমান ছিল। জনগণের এই আবেগকে কাজে লাগিয়েছিলেন হাতে-গোনা কয়েকজন মানুষ এবং কিছু বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল। জন্ম নিয়েছিল একের পর এক ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব। আজ অবধি নেতাজিকে অমুক জায়গায় তমুকের বেশে দেখতে পাওয়া গেছে বলে যতগুলি বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে, তাঁর কোনওটিরই কোনও বাস্তবসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, মার্কিন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ কোনও না কোনও ষড়যন্ত্র-তত্ত্বে ‘বিশ্বাস’ করেন। ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ববিদ ক্যারেন ডগলাস তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে এই ‘কনস্পিরেসি থিয়োরিস্ট’-দের কোনও একটা ঘটনায় ‘বিশ্বাস’ এবং সেই বিশ্বাসের লাগাতার প্রচারের কারণ হিসেবে একধরনের আত্মমুগ্ধতার প্রতিপালন এবং কোনও একটা প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিকে দায়ী করেছেন। প্রথমটি, আত্মমুগ্ধতা। আমিই সবথেকে সুন্দর, আমি সবার থেকে একটু আলাদা, আমি অন্যরকম সিনেমা বানাই— এই ধরনের নারসিসিজ়ম আর কী! দ্বিতীয়টি, অভিসন্ধি। মোটিভ— তা হতে পারে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক কিংবা আরও অন্য-কিছু। ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব, গুজব ইত্যাদি বাজারে চিরকালই ‘খায়’ ভাল। তবে, তাইহোকু বিমানবন্দরে একটি বিমান ভেঙে পড়া এবং সেই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটিকে নতুন করে এক ‘অন্তর্ধান রহস্যের মোড়কে’ বই এবং চলচ্চিত্র রূপে পেশ করার পিছনে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক বিপণন নেই। এখানেও সেই একই আত্মপ্রচার এবং প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধির গড্ডলিকা কাজ করে চলেছে। বুঝিয়ে বলছি।

কগনিটিভ সাইকোলজির অধ্যাপক ডেভিড লুডেন *সাইকোলজি টুডে*-তে লিখেছেন, ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি আসলে কিছু ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন ধরুন, হয়তো কারও ধারণা ছিল অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিডনি। কিন্তু যেই সে জানতে পারল, সিডনি নয়, অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী আসলে ক্যানবেরা, একটু অবাক হলেও, সে নিজের ভুল শুধরে নিল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে কোনও ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার নেপথ্যে কোনও অভিসন্ধি থাকে, সেক্ষেত্রে ভুল শুধরে নেওয়াটা সহজ হয় না।’ এটা আসলে বিপণনের এক প্রাচীন পদ্ধতি— বোঝাতে না পারলে, বিভ্রান্ত করে দাও। কনভিন্স করতে ব্যর্থ হলে, কনফিউস করে দাও। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’-এর কথা। আমরা জানি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের জন্য বিশ্বের উষ্ণতা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় থেকে বাঁচার পন্থা হিসেবে বিশেষজ্ঞরা যে পদক্ষেপগুলি রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকদের নিতে উপদেশ দিচ্ছেন, তা মেনে নিলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক এবং কঠোর পরিবর্তন আবশ্যিক। এদিকে, যাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন ব্যাপারটা একটা ভাঁওতা, তাঁরা বলছেন, ‘ধুর, এসব বাজে কথা, ভিত্তিহীন। দেখতে পাচ্ছেন না এবছর কী রেকর্ড-ভাঙা ঠান্ডা পড়েছে?’ এই যুক্তি শুনে, একটা বড়সংখ্যক মানুষের মধ্যে দোটানার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, হুট করে নিজের ‘কমফর্ট জোন’ থেকে বেরিয়ে না আসার একটা ছুতো আমাদের সামনে রুপোর থালায় সাজিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে। এখানে আত্মমুগ্ধতা না হলেও, আত্মসন্তুষ্টি কাজ করছে। এবং ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটি ধাপ্পাবাজি’— এই থিয়োরি প্রচারের কায়েমি স্বার্থটা যে কিছু দৈত্যাকার কর্পোরেট সংস্থা, তাদের মালিক এবং সেই মালিকদের পকেটস্থ রাজনৈতিক নেতাদের, তাও কারও অজানা নয় আজকে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য একটা কনস্পিরেসি থিয়োরিই যে যথেষ্ট, তা বোঝাতে পেরেছি আশা করি। নেতাজির মৃত্যুকে ঘিরে একটা আরোপিত রহস্যের জাল বুনে চলার পিছনেও সেই একই ‘ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে’। নেতাজির সমসাময়িক এক রাজনেতাকে তাঁর ‘চিরশত্রু’ এবং আমাদের দেশের ‘সুপার-ভিলেন’ প্রতিপন্ন করার জন্য এর থেকে ভাল ‘ফ্রেম-আপ’ আর হয় না যে! সুস্থ সমাজ এবং রাজনীতিতে এ এক বিপজ্জনক এবং বিষাক্ত প্রবণতা। সেইদিন আর নেই, যখন ষড়যন্ত্রের গুজব বেচে-খাওয়া লোকেদেরও কিছু অর্ধসত্য কিংবা খণ্ডচিত্রের প্রয়োজন হত। আজ গুজব রটাতে গেলে কেবল একটু সন্দেহ, একটু বিদ্বেষই যথেষ্ট।

৩

এই ভবঘুরের কিন্তু আজও রাতের ঘুম চলে যায় সেই রোমহর্ষক দিনগুলির কথা ভাবলে, যখন নদী পার করে, আরাকানের দুর্ভেদ্য পাহাড়ি জঙ্গলে, এক অসম কিন্তু দুঃসাহসিক যুদ্ধে একটু একটু করে স্বদেশের দিকে এগিয়ে চলছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের নেহরু, গাঁধী এবং সুভাষ ব্রিগেড। তাই কেবল লাইব্রেরির বই ঘেঁটে কৌতূহল মেটার কথা আমার নয়। আমার কেবলই মনে হয় সেই ‘সময়’-কে এবং তার কুশীলবদের কর্মকাণ্ড বুঝতে গেলে পৌঁছে যাওয়া দরকার অকুস্থলে। ছুঁয়ে আসা দরকার সিঙ্গাপুর থেকে মালয় পেনিনসুলা ধরে, বর্মার পাহাড়-জঙ্গল টপকে মণিপুরে পৌঁছনোর সেই পথ, যে পথ দিয়ে একদিন অগ্রসর হয়েছিল আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ! কখনও ট্রাকে, কখনও মালগাড়ির বগিতে বোঝাই হয়ে, কখনও পায়ে হেঁটে। যে পথে

ছড়িয়ে রয়েছে নেতাজি এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের অসংখ্য স্মৃতি— দুঃসাহস, আত্মত্যাগ, ক্ষণিকের বিজয়োল্লাস, অনেক রক্তক্ষরণ এবং এক হেরে-যাওয়া যুদ্ধের গ্লানি। যে পথে নামার আগে নেতাজি তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, অন্ধকারে অথবা সূর্যালোকে, দুঃখে অথবা সুখে, লাঞ্ছনায় অথবা বিজয়োৎসবে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। আজ আমি তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, ক্লেশদায়ক পদযাত্রা ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দিতে পারব না।'

তাই আরম্ভ হোক এক পথ চলা। শুরু হোক সিঙ্গাপুরের সেই পাদাং থেকে, যে ময়দানে দাঁড়িয়ে ১৯৪৩ সালের ৬ জুলাই নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিদর্শন করেছিলেন। যেখানে দাঁড়িয়ে নেতাজি তাঁর সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বলেছিলেন, 'Soldiers of India's Army of Liberation, today is the proudest day of my life. Today it has pleased Providence to give me the unique privilege and honour of announcing to the whole world that India's Army of Liberation has come into being.' তার ঠিক তিনদিন পরেই নেতাজি ঘোষণা করেছিলেন এক সর্বাত্মক প্রস্তুতির পরিকল্পনা। বলেছিলেন, 'I want total mobilization and nothing less.' গোটা পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতবাসীর হৃদয় জয় করে ফেলেছিলেন নেতাজি এই ঘোষণায়। এতদিন পরে যেন তাদের যোগ্য নেতার আগমন হয়েছে। এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণা বসু লিখেছেন: ' "কে বা আগে প্রাণ, করিবেক দান, পড়ি গেল কাড়াকাড়ি"। শুধু প্রাণ নয়— ধন-প্রাণ নিয়ে টোটাল মোবিলাইজেশনের ডাকে সাড়া দিলেন সকল ভারতবাসী।' তাই আমার এই পথ চলার একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল নেতাজি এবং তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর চরণরেখা ছুঁয়ে এক স্মৃতিরোমন্থন কিংবা ইতিহাসকে ফিরে দেখা নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের উত্তরাধিকারটিকেও খুঁজে বেড়ানো। গত এক বছর ধরে আমি নিজেকে নিয়োজিত করেছি নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত পড়াশুনায়। আজ সময় এসেছে পথে নামার। আমি প্রস্তুত নিজেকে সেই মানুষটির জীবনের অন্তিম অধ্যায়ের পদচিহ্ন অনুসরণ করাতে, যিনি ছিলেন ভারতবাসীর নেতাজি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে ডেকেছিলেন 'দেশনায়ক' সম্বোধনে। সেই দেশনায়কের পথে এবার শুরু হোক এই ভবঘুরের তীর্থযাত্রা।

৪

এটুকু অনেকদিনই বুঝেছিলাম যে কেবল কৌতূহল আর কাজ চালানোর মতো একটু-আধটু পড়াশুনা দিয়ে দেশনায়কের পথে পা বাড়ানো উচিত নয়। তাই একজন 'নেতাজি-স্কলার' না হয়েও নিজেকে যথাসাধ্য নিয়োগ করলাম পড়াশুনায়। আমার পড়াশুনার কেন্দ্রবিন্দু থাকল নেতাজির জীবনের এই শেষ অধ্যায়— যে অধ্যায়টি স্বয়ং নেতাজির ভাষায়— তাঁর 'কাজের অধ্যায়'। এই 'কাজ'-এর ব্যাপারটা একটু খুলে বলি তা হলে। নেতাজির নিজের হাতে লেখা দু'পাতার একটা ডেটলাইনের ছবি দেখতে পাওয়া যায় নেতাজির এলগিন রোডের বাসভবনে গেলে। নেতাজির সচিত্র জীবনীতেও এই দু'পাতার ছবি রয়েছে। সেই ডেটলাইনের দ্বিতীয় পাতার শেষের এন্ট্রিগুলো অনেকটা এইরকম:

*1938—– Selected President of Congress

*1939 January—– Re-elected President

1939 May—– Resigned Presidentship and organized ‘Forward Bloc’

1940 July—– Arrested again

1940 November—– Hunger-strike in Jail—– released after one week

*January 1941—– Left home

*May-June 1943—– Arrived in East Asia

July 1943—– Began work

এখানেই এন্ট্রি শেষ। সাল এবং মাসের পাশে অ্যাস্টেরিস্ক (*) চিহ্নগুলোও নেতাজিরই দেওয়া। যখনই আমি এই দুটি পাতার দিকে তাকাই, নেতাজির নিজের হাতে লেখা এই দলিল আমাকে যেন অনেক কিছু বলতে চায়। তার প্রথম কারণ, এটি নেতাজির নিজের হাতে লেখা একটা দলিল। কোনও গবেষক কিংবা ঐতিহাসিকের নয়। ফলে, অনেকটাই ডায়েরি লেখার মতোই এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য। দ্বিতীয় কারণ, ১৯১৪ থেকে জুলাই ১৯৪৩ পর্যন্ত বিস্তৃত এই লেখায়, নেতাজি তাঁর নিজের মতে, তাঁর জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে এখানে উল্লেখ করে গেছেন। তাই, প্রথমেই যে বিষয়টি আমার নজর কাড়ে সেটা এই দলিলের শেষ এন্ট্রি: ‘জুলাই ১৯৪৩—– বিগ্যান ওয়ার্ক’—– কাজ শুরু করলাম। লক্ষণীয়ভাবে, এই শেষ এন্ট্রিতে—– ‘আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নিলাম’, ‘টোটাল মোবিলাইজেশনের’ ডাক দিলাম, কিংবা ‘যুদ্ধ ঘোষণা করলাম’—– এই জাতীয় কোনও কথাই নেতাজি লেখেননি। লিখেছেন, ‘কাজ’ শুরু করলাম—– ‘বিগ্যান ওয়ার্ক’। এই ‘কাজ’ যে কী, তা বোঝার জন্য নেতাজি-স্কলার হতে হয় না। ১৯৪৩-এর জুলাই মাসেই, সিঙ্গাপুরে, প্রথমে ক্যাথে হল এবং পরে পাদাং-এর প্রকাশ্য সমাবেশে নেতাজির ডাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সেদিন যেরকম সাড়া জেগেছিল সে সম্বন্ধে কৃষ্ণা বসু লিখেছেন: ‘এক একটি পরিবারে বাবা, মা, ছেলে, ভাইবোন সকলে কোনও না কোনও প্রকারে আজাদ হিন্দ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ছেলেরা যোগ দিল আজাদ হিন্দ ফৌজে, মেয়েরা রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টে, ছোটরা হয়তো বালসেনাতে, আর যাঁরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কোনও কারণে যোগ দিতে পারবেন না তাঁরাও সিভিলিয়ান বা অসামরিক বিভাগে বিভিন্ন কাজে লেগে পড়লেন। সবচাইতে আশ্চর্যের কথা, এঁদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন যাঁরা স্বদেশ কোনওদিন চোখে দেখেননি, ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনও ধারণাই তাঁদের ছিল না, অনেকে পরে আমাদের বলেছেন, হয়তো গাঁধীজির ছবি একটা ছিল বাড়িতে, হয়তো ভাসাভাসা ভাবে জওহরলাল নেহরু বা সুভাষ বোসের নাম শুনেছিলেন তাঁরা। কিন্তু নেতাজি এসে ডাক দেবার পর ওঁদের জীবনধারা আমূল পালটে গেল।’

অতএব, ‘কাজ’ বলতে নেতাজি ঠিক কী বলছিলেন, তা আর বোঝার অপেক্ষা রাখে না আশা করি। তবে এই দু’পাতার এন্ট্রির অন্য একটা বিষয়ও আমাকে অল্প হলেও ভাবিয়ে চলেছে। সেটা হচ্ছে এই দলিলে নেতাজির বছর এবং মাস লেখার পদ্ধতি। ১৯১৪ থেকে ১৯৪০-এর নভেম্বর পর্যন্ত সবক’টি এন্ট্রিতেই মাসের আগে লেখা বছর। যেমন, ‘১৯৩৯ জানুয়ারি—– রি-ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট’। গোটা দলিলের ব্যতিক্রম ঘটছে

১৯৪১, অর্থাৎ, সেই মহানিষ্ক্রমণের সময় থেকে। এবার আগে আসছে মাস, পরে বছর। এরকম ছন্দপতন নেতাজির মতো মেটিকুলাস মানুষের হাতে ঘটা, একটা খটকা আমার কাছে। আমার এই ধারণার সপক্ষে যুক্তি হিসেবে আমি ফিরে যেতে চাই, ১৯ এবং ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩-এর মধ্যরাতে— সিঙ্গাপুরের মেয়ার রোডে — নেতাজির বাড়িতে। নেতাজি তাঁর ডেস্কে ঝুঁকে পড়ে পেনসিলে লিখে চলেছেন পাতার পর পাতা। একটা করে পাতা লেখা শেষ হচ্ছে আর সেটা তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে সিব্বিয়ার আপ্পাদুরাই আইয়ার সাহেবের টেবিলে টাইপ করার জন্য পৌঁছে দিচ্ছেন আবিদ হাসান সাফরানি এবং এন জি স্বামী। লিখতে লিখতে একবারও মুখ তুলছেন না নেতাজি, এমনকী আগের পাতায় কী লিখেছেন তা একবারও জানতে চাইছেন না। মাঝেমধ্যে কালো কফিতে চুমুক দিচ্ছেন কেবল। কাজ যখন শেষ হল, তখন সকাল হতে চলেছে। আইয়ারসাহেব পরে বলেছিলেন, 'আমাকে যে বিষয়টি হতবাক করেছিল তা হল, নেতাজি একবারের জন্যও আগের পৃষ্ঠায় কী লিখেছিলেন দেখতে চাননি। গোটা দলিল যখন লেখা শেষ হল তখন তাতে একটাও বানান কিংবা ব্যাকরণের সংশোধন করার দরকার হয়নি।' এইরকম একটা ঐতিহাসিক দলিল যিনি একবারও রিভাইস না করে, নিখুঁতভাবে একটানা লিখে দিতে পারেন, তাঁর নিজের জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ডেটলাইন লেখার সময় সন-মাসের এইরকম 'অর্ডার অ্যান্ড মেথড' হঠাৎ বেতাল হয়েছিল কেন? দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অগণিত বিনিদ্র রাতের ফসল কি এই ছন্দপতন? পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা ব্যাপার এতক্ষণ ধরে লিখে কী প্রমাণ করতে চাইছেন লেখক? আমার মনে হয়েছে, এই দলিলে বছরের আগে মাসের আবির্ভাবের মূল কারণ সেই সময়ের ঘটনাবহুলতা এবং প্রত্যেকটি ঘটনার গুরুত্ব। কারণ, কেবল শরীর এবং মনের ধকল নয়, আমার মনে হয় নেতাজি তখনই জানতেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ণায়ক অধ্যায়ের অতিমানবিক দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। বুঝেছিলেন যে, ঘটনার প্রবাহ এবং বৈচিত্র্য আর বছরের টাইম স্কেলে হবে না, সেটা এবার দিনের বা মাসের হিসেবে চলবে। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তিন বছর আগে লেখা, তাঁর নিজের রাজনৈতিক টেস্টামেন্ট এবার বাস্তব রূপ পেতে চলেছে। ২৬ নভেম্বর ১৯৪০, নেতাজি লিখেছিলেন: 'This is the technique of the soul. The individual must die, so that the nation may live. Today I must die, so that India may live and may win freedom and glory.'

৫

নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নেবার সময় থেকেই জাপানিদের সঙ্গে একটা টানটান উত্তেজনার সম্পর্ক ছিল। মাঝেমধ্যেই সেই টানটান সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বিবাদেও পরিণত হত। ফলে জাপানি জেনারেল, সেনা অফিসার, কিংবা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নেতাজিকে সবসময়ই একটা ভয়ংকর একগুঁয়ে, একরোখা মেজাজে চলতে হত। আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে জাপানকে নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে হবে, এই কথা নেতাজি স্পষ্টভাবেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো-কে বলে দিয়েছিলেন ১০ জুন ১৯৪৩, টোকিওতে প্রথম সাক্ষাতেই। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতে, জাপানি সাদার্ন আর্মির কম্যান্ডার ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি-কেও এই একই কথা বলেছিলেন

নেতাজি। বলেছিলেন: 'the first drop of blood shed on Indian soil must be that of a soldier of the INA'— ভারতের মাটিতে প্রথম রক্ত যদি পড়েই তা যেন একজন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকের হয়। কারণ, জাপানি সৈনিকের আত্মত্যাগে ভারতের স্বাধীনতা লাভ হবে ক্রীতদাসত্বের থেকেও খারাপ।

আজও, নেতাজির প্রাথমিকভাবে জার্মানির এবং পরে জাপানের সাহায্য নেবার বিষয়ে শুনতে পাওয়া যায়, 'হিটলারের জার্মানি এইরকম অত্যাচার করেছিল' কিংবা 'তোজোর জাপান এত পাশবিক ছিল'— এই জাতীয় কথা। সে তো ঠিকই। কিন্তু, প্রশ্ন হল, চার্চিলের ব্রিটেন আর রুজভেল্ট-ট্রুম্যান-এর আমেরিকা কি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল? চার্চিল এবং তাঁর ব্রিটেনের কথায় একটু পরেই আসছি। আর সত্যিই তো, আমেরিকা তো বিশেষ কিছু করেনি, একটা অ্যাটম বোমা ফেলেছিল, এই যা! যুদ্ধের সময় নিজের সুখ্যাতি করে প্রচার সব পক্ষই করে। একেই বলে প্রোপাগান্ডা। নেতাজি একবার বলেছিলেন, তিনি ব্রিটিশের হাউইৎজার কামানের থেকে তাদের প্রোপাগান্ডাকে বেশি ভয় করেন। কিন্তু, তাই বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে প্রোপাগান্ডা শুনতে পাওয়া যেত তা এখনও, এই স্বাধীন ভারতবর্ষে বসে আমাদের শুনে যেতে হবে কেন? নিরপেক্ষ বিচারে যুদ্ধ-অপরাধী সবাই। 'ওয়ার অ্যান্ড অ্যাট্রোসিটি'— একই মুদ্রার দুটি পিঠ। যুদ্ধ হলে অন্যায়, অত্যাচার, নৃশংসতা, ভয়াবহতা, অমানবিকতা হবে, কারণ সেগুলো ছাড়া যুদ্ধ হয় না। আমার যুদ্ধ ভাল আর তোমার যুদ্ধ ঘৃণ্য— তা কী করে হয়? এই হালের কথা— যেই শোনা গেল আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপের নাম বদলে সুভাষ বোসের নামে করা হতে পারে, অমনি মিডিয়ার এক শ্রেণি লিখে দিলেন, কী ভয়ানক নৃশংসতাই না জাপানিরা করেছিল! জাপানিদের সঙ্গে নেতাজিকেও আন্দামান দ্বীপবাসীরা নাকি ঘৃণার চোখে দেখত! ভাবুন একবার, এখনও কি তা হলে আমাদের সমাজে সেই প্রোপাগান্ডার একটা চোরাস্রোত বয়ে চলেছে?

অ্যাট্রোসিটির কথাই যখন উঠল, তখন চলুন ফিরে আসি সেই ১৯৪৩ সালে, ঠিক যখন নেতাজি দক্ষিণ এশিয়ায় পা রাখছেন। ভারতের লাটসাহেবের জনস্বাস্থ্য বিভাগ জানালেন, সে বছর দুর্ভিক্ষে আমাদের বাংলায় ৬,৮৮,৮৪৬ জন মারা গেছেন। টিম ডাইসন এবং অরূপ মহারত্ন গবেষণা করে দেখলেন সরকার বাহাদুরের হিসেবে বেজায় গরমিল— দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা অন্তত ২১ লাখ! তার কিছুদিন পর, প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়ের হিসেবে জানা গেল সংখ্যাটি ২১ নয়, ৩১ লাখ। আর তারও কিছুদিন পর, না খেতে পেয়ে মরা এবং অপুষ্টিতে ভুগে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা যোগ করে দাঁড়াল ৫৪ লাখ! আজ জানা গেছে, ঠান্ডা মাথায় করা এই গণহত্যার দায়-দায়িত্ব সব ছিল উইনস্টন চার্চিলের। এ বিষয়ে বিশদে জানতে গেলে অধ্যাপক সুগত বসুর প্রবন্ধ 'Starvation amidst Plenty: the Making of Famine in Honan, Bengal and Tonkin, 1942-1945' (*মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ,* ১৯৯০), মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়ের *চার্চিল'স সিক্রেট ওয়ার* এবং জনম মুখোপাধ্যায়ের বই পড়তে হবে। চার্চিলের এই নৃশংস মাস মার্ডারের সামনে হিটলার শিশু। সেই সময় নেতাজি বারবার চেষ্টা করেছিলেন, রেঙ্গুন এবং মালয় পেনিনসুলা থেকে জাহাজে করে বাংলায় খাবার পাঠাতে। ইংরেজ সরকার তা আসতে দেয়নি। তবে ভারতের শেষ সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানিদের সাহায্য নেতাজি কোন পরিপ্রেক্ষিতে নিয়েছিলেন সে-কথা বুঝতে গেলে আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সমসাময়িক ভারত ও পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নেতাজির বিপ্লবী চিন্তাধারা সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার।

জাপান, তার জাতীয়তাবাদ এবং তার এক জোটবদ্ধ বৃহত্তর এশিয়ার চিন্তাভাবনার প্রতি নেতাজিকে প্রথম আকর্ষণ করেছিল রবীন্দ্রনাথের চিরবান্ধব ওকাকুরার লেখায়। মতাদর্শগত ব্যাপারে বেশকিছু জায়গায় মিল না থাকলেও ওকাকুরা এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল আজীবন। ১৯০৩-এ ওকাকুরা লিখেছিলেন: 'Asia is one. The Himalayas divide only to accentuate, two mighty civilizations, the Chinese with its communism of Confucius and the Indian with its individualism of the Vedas.' তার এক বছর পরেই আবার লিখেছিলেন: 'এশিয়ার অবমাননায় পাশ্চাত্যের গরিমা'— 'the glory of the West is the humiliation of Asia।' ওকাকুরার এই প্যান-এশিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শনই পরবর্তীকালে নেতাজিকে জাপানের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ওকাকুরার মৃত্যু হয় ১৯১৩-র সেপ্টেম্বর আর তার ঠিক দু'মাস পরেই নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৬-য় কবি তাঁর জাপান সফরের বক্তৃতায় আগাগোড়া উগ্র জাতীয়তাবাদ-বিরোধী এবং ওকাকুরার নাম উল্লেখ না করেই তাঁর জাপানকেন্দ্রিক প্যান-এশিয়ার চিন্তা-বিরোধী বক্তব্য রাখেন। বলাবাহুল্য, সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী জাপান কবির এই বক্তব্য ভাল চোখে দেখেনি। এক দশকের বেশি সময় পার করে, ১৯২৯-এ তাঁর তৃতীয় জাপান সফরে কবি ওকাকুরা-কে 'দি ভয়েস অফ ইস্ট' বা 'পূর্বের কণ্ঠস্বর' বলে তাঁর আন্তরিক এবং আবেগ-জড়ানো ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা জানান।

সময়টা ভাবুন একবার! ১৯২৭-এ মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরেছেন নেতাজি, গ্রহণ করেছেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারির পদ। তার পরের বছরই, ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বাৎসরিক মিটিং আয়োজন করছেন, আইন অমান্যের জন্য আবার জেলে যাচ্ছেন, আর ১৯৩০-এ নির্বাচিত হচ্ছেন কলকাতার মেয়র পদে। তাই, স্বাধীনতা আন্দোলনের এই চরম উদ্দীপনাময় এবং ঘটনাবহুল সময়ে কবিকণ্ঠে ওকাকুরার দর্শনের প্রতি এই স্বীকৃতি, নেতাজির কাছে অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলেই আজ মনে হয়। ওকাকুরার কাজ এবং দর্শন প্রভাব ফেলেছিল তাঁর সমসাময়িক রুশ-জাপান যুদ্ধে(১৯০৪-১৯০৫) এবং অনেক পরে এই যুদ্ধের উদাহরণ নেতাজি দিয়েছিলেন। ১৯ জুন ১৯৪৩-এ নেতাজি টোকিওতে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন, 'চল্লিশ বছর আগে আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি, তখন জাপানের মতো এক ক্ষুদ্র দেশের, রাশিয়ার মতো এক বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তিকে যুদ্ধে হারানোর খবর আমাদের সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধে জাপানের সাহসিকতা এবং বীরত্বের গল্প আমাদের মধ্যে নিত্য আলোচিত হত। সেই সময় থেকেই ভারতের মানুষ হিসেবে আমরা অ্যাডমিরাল টোগো এবং জেনারেল নোগি-কে শ্রদ্ধা করি।'

নেতাজি জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করেন ১৯৩৮ থেকেই। বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে সে এক দ্রুত পরিবর্তনশীল অনিশ্চিত সময়। এই সময় কলকাতায় জাপানি বিদেশমন্ত্রকের জনৈক মি. ওহাসির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা শোনা যায়। ১৯৩৯-এর জানুয়ারি, নেতাজি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মে মাসে পদত্যাগ করেন। ফরোয়ার্ড ব্লক-এর জন্ম হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। নেতাজি এই খবর পান, তার ঠিক দু'দিন পর, মাদ্রাজে ফরোয়ার্ড ব্লকের এক জনসভায়। তার পরের বছরই, ১৯৪০-এ, এক বিশ্বস্ত সহযোগী লালা

শঙ্করলালকে তিনি জাপান পাঠান সাহায্যের আশায়। এদিকে, ১ আগস্ট ১৯৪০, জাপান, জার্মানি এবং ইতালির সঙ্গে এক ত্রি-পাক্ষিক চুক্তিতে সই করে— গড়ে ওঠে অ্যাক্সিস— অক্ষশক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভেঙে দিয়েছিল। একদিকে ছিল অ্যালাইড ফোর্সেস— মিত্রশক্তি; অন্যদিকে অ্যাক্সিস— অক্ষশক্তি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দেশগুলি, যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা মিলে গড়ে উঠেছিল ব্রিটেনের মিত্রশক্তি। অন্যদিকে এক ত্রি-পাক্ষিক চুক্তিতে জার্মানি, ইতালি এবং জাপান একজোট হয়ে গড়ে তুলেছিল অ্যাক্সিসের মূল ভিত্তি।

১৭ জানুয়ারি ১৯৪১, শুরু হয় ঐতিহাসিক মহানিষ্ক্রমণ এবং ২ এপ্রিল নেতাজি পৌঁছন বার্লিন। এই পর্বে প্রথমে সোভিয়েত রাশিয়ার এবং পরে ইতালি কিংবা জার্মানির সাহায্য না পাওয়ার ব্যর্থতা নেতাজির দৃষ্টি ফেরায় জাপানের দিকে। নেতাজি জানতেন, ইতালি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগ্রহ দেখালেও তার নিজের সামরিক ক্ষমতা অ্যাক্সিস-ত্রয়ীর মধ্যে সবথেকে কম ছিল। আর স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে জার্মানির পর্যুদস্ত হওয়া এবং রাশিয়ার ব্রিটিশ-ঘেঁষা হয়ে যাওয়ার ঘটনা নেতাজি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই হতাশার মধ্যে একমাত্র আশাব্যঞ্জক ছিল জাপানের দুর্ধর্ষ সামরিক সাফল্য এবং তাদের স্বঘোষিত 'কো-প্রসপারিটি'র বিদেশ নীতি। জাপানের বিদেশমন্ত্রী (জানুয়ারি-জুলাই ১৯৪০) আরিতা হাচিরো জানিয়েছিলেন, জাপান পরিকল্পিত 'গ্রেটার ইস্ট এশিয়া স্ফিয়ার'-এ জাপানের জাতীয় স্বার্থ কাজ করবে না। বরং, তারা সাহায্য করবে এই বলয়ের অন্তর্গত ছোট দেশগুলিকে নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। কয়েকমাস পরেই, তোজোর হাত ধরে ফিলিপিনস এবং বর্মার স্বাধীনতা ফিরে আসার ঘটনা— জাপানের এই প্যান-এশিয়া সহযোগিতার মডেল হিসেবে নেতাজির এবং পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে এক বিরাট ভরসা জুগিয়েছিল। পূর্ব এশিয়ায় পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব এবং সব বিষয়ে খবরদারি বন্ধ করার উপায় হিসেবে এই বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া বলয়ের ধারণাটা প্রাথমিকভাবে ছিল প্রধানমন্ত্রী ফুমিমারো কোনোয়ে (১৯৪০-৪১)-র। এই কোনোয়েই আবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনায় বসে আমেরিকা-জাপানের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ রোখার। কোনোয়ের আন্তরিক উদ্যোগ সত্ত্বেও আমেরিকার সঙ্গে জাপানের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ানো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সম্রাট হিরোহিতো যুদ্ধের পক্ষেই সায় দেন এবং প্রথম আঘাত হিসেবে ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১, পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ করে জাপান। আমেরিকা পাকাপাকিভাবে প্রবেশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায়।

ঘটনার ঘনঘটা যখন তুঙ্গে, তখন জাপানি আর্মির এক তরুণ অফিসার ইওয়াইচি ফুজিওয়ারা ব্যাংককে (অক্টোবর ১৯৪১) আসেন সেখানে লুকিয়ে থাকা ভারতীয় বিপ্লবীদের খোঁজে— দেখা হয় প্রীতম সিং-এর সঙ্গে। ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১, জাপানি সৈন্যদল মালয় পেনিনসুলায় ব্রিটিশকে হারিয়ে দক্ষিণে সিঙ্গাপুরের দিকে এগোতে থাকে। এই সময় একদিন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির একদল সৈনিক জাপানি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই দলে ছিলেন মোহন সিং। ফুজিওয়ারা এবং প্রীতম, মোহন সিংকে বলেন, যদি মাতৃভূমির মুক্তি চাও তো এই সুযোগ! আমাদের দলে যোগ দাও। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২, সিঙ্গাপুর ব্রিটিশের হাতছাড়া হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি, সিঙ্গাপুরের ফেরার পার্কে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের সমাবেশে ফুজিওয়ারা এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর যৌথ প্রচেষ্টায় জন্ম নেয় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'। এদিকে, ২৮-৩০ মার্চ ১৯৪২, টোকিও কনফারেন্সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন রাসবিহারী

বোস। সেই বছরই জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় ব্যাংকক কনফারেন্স। গঠিত হয় 'কাউন্সিল ফর অ্যাকশন', এবং তার চেয়ারম্যান হন সেই রাসবিহারী বোস। ঠিক হয়, এই কাউন্সিল এবং তার কমিটির নির্দেশমতো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি কাজ করবে। কিন্তু ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে এই প্রথম 'আইএনএ' ভেঙে যায়। মোহন সিং গ্রেফতার হন এবং আইএনএ-র সৈনিকরা আবার যুদ্ধবন্দিতে পরিণত হয়। ব্যাংকক কনফারেন্সে তাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল পিবুল সংগ্রাম এক বার্তায় লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'তাইল্যান্ডের মানুষ স্বাধীনতার মর্যাদা বোঝে। তাই ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তাইল্যান্ডের রয়েছে পূর্ণ সহানুভূতি।' অবশেষে, ১৯ জুন ১৯৪৩, টোকিওতে নেতাজি তাঁর ঐতিহাসিক প্রেস কনফারেন্সে জানান তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এরপরের ঘটনাবলির টাইমলাইন তার গতিময়তায় অনবদ্য।

২ জুলাই ১৯৪৩, সিঙ্গাপুরের কালাং এয়ারস্ট্রিপে নামলেন নেতাজি। ৪ জুলাই, ক্যাথে হলের এক বিপুল জনসমাবেশে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' এবং 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'-র দায়িত্ব নেতাজির হাতে তুলে দিলেন রাসবিহারী বোস। ৫ জুলাই, আইএনএ-র নাম বদলে জন্ম হল আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর। সেই দিনই পাদাং থেকে নেতাজি ঘোষণা করলেন, 'চলো দিল্লি!' ৯ জুলাই আরম্ভ হয়ে গেল রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট তৈরির কাজ। ২১ অক্টোবর ১৯৪৩, সেই ক্যাথে হলেই নেতাজি পড়ে শোনালেন আজাদ হিন্দ সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ২৪ অক্টোবর, পাদাং-এর ময়দান থেকে, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি সেনাসমাবেশে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নেতাজি। বললেন, ওয়ার টু দি ফিনিশ। ৫-৬ নভেম্বর নেতাজি আবার টোকিওতে এলেন গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কনফারেন্সে যোগ দিতে। এখানেই এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন নেতাজি। বললেন, 'This is an assembly of liberated nations, an assembly that is out to create a new order in this part of the world, on the basis of the sacred principles of justice, national sovereignty, reciprocity in international relations and mutual aid and assistance. I do not think that it is an accident that this Assembly has been convened in the Land of the Rising Sun.' নেতাজির এই বক্তৃতা গোটা সমাবেশকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। নেতাজির বক্তব্য শেষ হতেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী তোজো। বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের সম্পূর্ণ সমর্থন থাকবে এবং খুব শীঘ্রই আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপান আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেবে। এই কনফারেন্সেই বর্মার প্রধানমন্ত্রী বা ম বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না এলে এশিয়ার প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। ২৫ নভেম্বর, নেতাজি সিঙ্গাপুরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। এক মাসের মধ্যেই, মালয় পেনিনসুলা ধরে— কখনও ট্রেনে, কখনও ট্রাকে, কিংবা কখনও হেঁটে— আজাদ হিন্দ ফৌজ পৌঁছে গিয়েছিল রেঙ্গুন। ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪, আজাদ হিন্দের সুপ্রিম কমান্ড সিঙ্গাপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চলে এসেছিল রেঙ্গুন। ১৮ মার্চ ১৯৪৪, আজাদ হিন্দ ফৌজ তার অন্তিম সংগ্রামের পথে রওনা হয়েছিল। সেইদিন নেতাজি তাঁর 'অর্ডার অফ দি ডে'-তে লিখেছিলেন: 'There, there in the distance-beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills lies the promised land— the soil from which we sprang— the land to which we shall now return.' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এরকম হৃদয়গ্রাহী আত্মত্যাগের কবিতা আর সম্ভবত কেউ লিখতে পারেননি!

দেশনায়কের পথে, আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতি জড়ানো রাস্তায় বেরনোর একটা হাতছানি অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে ছিল এবং এমন এক পথচলা কেন এক ভবঘুরের ধর্ম তা নিয়েও ইতিমধ্যেই বিস্তারে লিখেছি। যা লেখা হয়নি তা হল, সেই ইচ্ছেটাকে হঠাৎ বাস্তবে রূপায়িত করে ফেলার উদ্যোগের পিছনে তথ্যচিত্র নির্মাতা সৌমিত্র দস্তিদারের অবদান। এক বছর আগে, সৌমিত্রদার সঙ্গে একদিনের একটা কথোপকথন আমার মধ্যে আজাদ হিন্দের পথে অনুগমনের ছাইচাপা আগুনটা আবার জাগিয়ে তোলে। প্রায় সেই একই সময়, দিনের পর দিন, বন্ধু সুমন রায়ের সঙ্গেও এই আজাদ হিন্দ-অনুপ্রাণিত পথে চলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছিল। শেষ পর্যন্ত, সৌমিত্রদা কিংবা সুমন, কারও সঙ্গেই এই পথ চলা হল না। সৌমিত্রদা ব্যস্ত তাঁর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র নির্মাণে, আর সুমন ছুটল গল্পের সন্ধানে কেনিয়ার কোন মাসাই গ্রামে। তিন ভবঘুরের একজোট হওয়া এ যাত্রায় হল না। তবে একটা আইডিয়ার জন্ম হওয়াই-বা কম কথা কীসের! আর সেই জন্যই আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম সুমন এবং সৌমিত্রদার কাছে।

প্রথমদিকে একবার ভেবেছিলাম সীতাহরণকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সীতাহরণ অর্থাৎ আমার সাহারা মরুভূমির সহচর, আমার বাইসাইকেল। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে সাইকেল ভ্রমণের জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা আমার অনেকদিনই জানা ছিল। কাজেই সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়া, তাইল্যান্ড হয়ে মায়ানমার পৌঁছে যাওয়ার হাতছানি অল্প হলেও আমার মনে ছিল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে আমার পড়াশুনো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা বুঝেছিলাম যে, এই কাজ নিছক বাইসাইকেল টুরিস্টের নয়; কারণ, আজাদ হিন্দ ফৌজের পথ অনুসরণ করাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমার কাজ এবার অনেকটাই গবেষণাধর্মী এবং তার ফলে এক বিন্দু থেকে পরবর্তী বিন্দুতে এগিয়ে যাবার সরল পদ্ধতিতে পথ-চলায় এবার সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই এবার আমার ভবঘুরেমি হবে অনেকটাই ব্যাকপ্যাকিং ঘরানায়। অল্প-কিছু জামাকাপড়, কিছু জরুরি বইপত্র, ফোন, ক্যামেরা এবং একটা ল্যাপটপ— এই হবে আমার আগামী দিনগুলির সঙ্গী। সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনী, কখনও ট্রেনে, কখনও ট্রাকে, কখনও পায়ে হেঁটে পৌঁছেছিল রেঙ্গুন— আজকের ইয়াঙ্গন। আমারও ঠিক সেরকমভাবেই সিঙ্গাপুর থেকে এগিয়ে চলার পরিকল্পনা ছিল। আমি জানতাম, দেশনায়কের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি প্রত্যক্ষ করার এক অদম্য ইচ্ছাই আঁকবে আমার পথের মানচিত্র এবং সেই উত্তাল সময়ের উত্তরাধিকারের খোঁজ হবে আমার সেই মানচিত্রের স্কেল।

মানচিত্রের কথায় মনে পড়ল পলিনেসিয়ান অভিযাত্রী ড. এলিজাবেথ লিন্ডসে-র কথা। ড. লিন্ডসে এক জায়গায় বলেছিলেন, পথের অনুসন্ধান আরম্ভ হয় মানুষের হৃদয়ে, সেখানেই আঁকা হয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি, হৃদয় থেকে বার করে সেই ম্যাপকে একটা কাগজের ওপর এঁকে ফেলাও ভীষণ জরুরি, বিশেষ করে একটা লম্বা সফর শুরুর ঠিক আগেই। আমি তাই আমার রুট ম্যাপ আঁকার কাজে নেমে পড়ি। গৃহপালিত অ্যাটলাসে কাজ মনের মতো হচ্ছে না দেখে অনলাইনে জোগাড় করে ফেলি মালয়েশিয়া, তাইল্যান্ড এবং মায়ানমারের মানচিত্র। পাশে রাখি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের লেখা বইয়ের ভিতরের হাতে আঁকা ম্যাপগুলি। এবার নিজের মতো করে আঁকতে থাকি আমার যাত্রাপথের রূপরেখা। পথচলা শুরু সিঙ্গাপুর থেকে। সেখান থেকে জোহোর বাহ্রু হয়ে প্রবেশ মালয়েশিয়ায়। দেখি, দক্ষিণ

থেকে উত্তর-মালয়েশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে রেলপথ। গেমাস থেকে একটা লাইন চলে গেছে পূর্ব উপকূলের কোতা ভারু, আর অন্য একটা লাইন চলে গেছে কুয়ালালামপুর হয়ে আরও উত্তরে আলোর স্টার পার হয়ে তাইল্যান্ড সীমান্তের পাদাং বেসার। ১৫ আগস্ট ১৮৫৪, পূর্ব ভারতের প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলেছিল হাওড়া থেকে হুগলি। মালয়েশিয়াতে রেলব্যবস্থা চালু হতে আরও প্রায় তিরিশ বছর লেগেছিল। আজ মালয়েশিয়ার ১১টি রাজ্য জুড়ে রেল যোগাযোগ রয়েছে, সংযোগ রয়েছে তাই রেলওয়েজের সঙ্গেও। ফলে সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংকক আজকাল কয়েকবার ট্রেন বদল করেই চলে আসা সম্ভব। ভবিষ্যতে মিয়ানমারের রেলব্যবস্থা উন্নত এবং উন্মুক্ত হলে হয়তো একদিন সিঙ্গাপুর থেকে একই ট্রেনে চিন কিংবা ভারত আসা সম্ভব হবে।

আমি অবশ্য দেখতে থাকি রেল এবং বাস ব্যবহার করে আমার প্রয়োজনীয় সবক'টি শহর এবং গ্রামে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব কি না! মালয়েশিয়া, তাইল্যান্ড খুবই টুরিস্ট ফ্রেন্ডলি হওয়ায়, ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ানো যে খুব কঠিন হবে না, তা ম্যাপ আঁকতে গিয়েই মনে হয়েছিল। কোতা ভারু— যেখান থেকে জাপানিরা তাদের মালয় ক্যাম্পেন শুরু করেছিল, পেনাং দ্বীপ এবং কুয়ালালামপুর তো বটেই, এমনকী আলোর স্টার এবং সেরেমবানও খুব সহজেই ছুঁয়ে আসা যাবে মনে হল। তবে মিয়ানমারে ঢুকে পড়ার পর ব্যাপারটা যে আর তেমন সরল থাকবে না তাও বুঝতে পারছিলাম। তাইল্যান্ডের কাঞ্চনাবুড়ি থেকে মিয়ানমারের দাওয়েই সীমান্ত পারাপার সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছিলাম ভাসাভাসা। ব্যাংকক থেকে মায়ে-সত হয়ে মিয়ানমারের মুলমিন পৌঁছনোর পথ মনে হল অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। মনে হল, একবার মিয়ানমার ঢুকে পড়লে মুলমিন, মান্দালয়, মেইকটিলা, মেমিও নিশ্চয়ই যেতে পারব। কিন্তু প্রশ্ন হল, কালেমিওর পশ্চিমে তিদিমের দিকে যেতে দেবে কি? রাখাইনের ঝামেলা তো এখনও মেটেনি। ইয়াঙ্গন থেকে মুলমিন, প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ, রানি ঝাঁসি বাহিনীর সঙ্গে হেঁটে রিট্রিট করেছিলেন নেতাজি। এই পথে আমি সাইকেল চালিয়ে যাবার অনুমতি পাব কি? মোরে-টামু সীমান্ত দিয়ে শেষপর্যন্ত আমি মণিপুরে ঢুকতে পারব কি? এরকম আরও অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় ভিড় করে আসে। প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রশ্ন, খটকা— সব লিখে রাখি আমার হাতে-আঁকা ম্যাপে। আমি জানি, পথে নামলেই জট খুলে যাবে এক এক করে, মিলে যাবে আমার সব প্রশ্নের উত্তর!

৮

তবে মিয়ানমার তো অনেক দূর, সবার আগে আমার অপেক্ষায় ছিল সিঙ্গাপুর। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্মলগ্ন থেকে অন্তিম অধ্যায়, সব কিছুরই সে সাক্ষী। ১৯৪৩-এ, এই সিঙ্গাপুরেই গেলাং এলাকার এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. লক্ষ্মী স্বামীনাথন একদিন শুনতে গিয়েছিলেন নেতাজির বক্তৃতা। সেই বক্তৃতা বদলে দিয়েছিল তাঁর জীবন। ডা. লক্ষ্মী স্বামীনাথন হয়েছিলেন রানি ঝাঁসি বাহিনীর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী। ১৯৪২-এ সিঙ্গাপুর জাপানিদের হাতে চলে যাবার পর থেকেই ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের চিকিৎসা করতেন ডা. লক্ষ্মী আর পরিকল্পনা করতেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার। পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা বরাবরই অনেক আশা নিয়ে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন তাঁদের স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে। কিন্তু কেবল দূর থেকে দেখা এবং প্রার্থনা করা ছাড়া তাঁদের হাতে বিশেষ কিছু ছিল না। জাপানের কাছে ব্রিটেন আত্মসমর্পণ করার পর সিঙ্গাপুর এবং মালয়-প্রবাসী ভারতবাসীরা হাতে চাঁদ পেলেন। সিঙ্গাপুর হয়ে দাঁড়াল সেই আন্দোলনের লঞ্চ

প্যাড। কেবল সিঙ্গাপুর শহরেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সদস্য সংখ্যা সেসময় ছিল ৬০০০০। ইতিমধ্যে ফুজিওয়ারার তত্ত্বাবধানে এবং মোহন সিং-এর নেতৃত্বে প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি-ও গঠিত হয়ে গিয়েছিল। দেশের মানুষ অনেক করেছে, এবার আমরা প্রবাসীরাও কিছু করে দেখাব— এইরকম একটা উদ্দীপনাময় চিন্তাধারা সেসময় চরমে পৌঁছেছিল পূর্ব এশিয়ায়। মঞ্চ প্রস্তুত ছিল, অপেক্ষা ছিল কেবল নেতাজির এসে পৌঁছনোর।

সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের আন্দোলনের পন্থা হিসেবে সময়বিশেষে নানা বিচিত্র পদ্ধতি নিয়েছিলেন। সেইসব পন্থার সবথেকে পুরনো এবং পরিচিত নাম হল ১৮৮৫-তে স্থাপিত 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শেষ হবার পর থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একটা গতি এবং দিশা খুঁজে পায়। অনেক উত্থান, পতন, বিভাজনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই যাত্রা একটা চরম বিন্দুতে পৌঁছয় ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে, গাঁধীজির নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর হাত ধরে। স্বাভাবিকভাবেই ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রবাসী ভারতবাসীদের মনে এক প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করাই যায় যে, এই ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কিন্তু সেদিনের মুসলিম লিগ, আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেউ যোগ তো দেনই নি— উপরন্তু ব্রিটিশের সহায়তা করেছিলেন। আজ যখন সেইসব দলের নেতারাই দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, তখন তাকে প্রহসন ছাড়া কীই-বা বলা যায়! নেতাজি নিজে কিন্তু দেশের বাইরে থাকলেও, তাঁর রেডিয়ো সম্প্রচারে গাঁধীজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রশংসা করতে ভোলেননি। এদিকে, ২ জুলাই ১৯৪৩, সিঙ্গাপুরের সেই কালাং এয়ারস্ট্রিপে নেতাজি এসে নামলেন, যাকে প্রবাদপ্রতিম অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট বলেছিলেন, 'এভিয়েশন মিরাকল অফ দি ইস্ট।' ৪ জুলাই, ক্যাথে সিনেমা হলের এক বিশাল জনসভায় রাসবিহারী বোসের হাত থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নেতাজি বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন স্বদেশে ও প্রবাসে আমার সকল দেশবাসীকে সুখী করে আমার কর্তব্য সমাধা করতে পারি।' ২১ অক্টোবর ১৯৪৩, দেশের বাইরে স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকার গঠিত হল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র নেতাজি নিজে পাঠ করলেন। সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন নেতাজি। তিনি নিজে দায়িত্ব নিলেন যুদ্ধ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী দায়িত্ব নিলেন মহিলা সংগঠনের। লে. কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি পেলেন অর্থদপ্তর। প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে রইলেন রাসবিহারী বোস। সেনাবাহিনীর আটজন প্রতিনিধি এবং সব মিলিয়ে একুশজনের স্বাক্ষর রইল এই ঘোষণাপত্রে।



পাদাং এবং টাউন হল (সিঙ্গাপুর পর্ব)



ক্যাথে থিয়েটার (সিঙ্গাপুর পর্ব)



গবেষক নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তর সঙ্গে লেখক (সিঙ্গাপুর পর্ব)



সিঙ্গাপুর আর্ট মিউজিয়াম (সিঙ্গাপুর পর্ব)



বার্টলে রোডের রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী সমচিত্তানন্দ (সিঙ্গাপুর পর্ব)



নরিস রোডের পুরনো আশ্রমবাড়ি (সিঙ্গাপুর পর্ব)



এসপ্ল্যানেড পার্কে আইএনএ মেমোরিয়াল (সিঙ্গাপুর পর্ব)



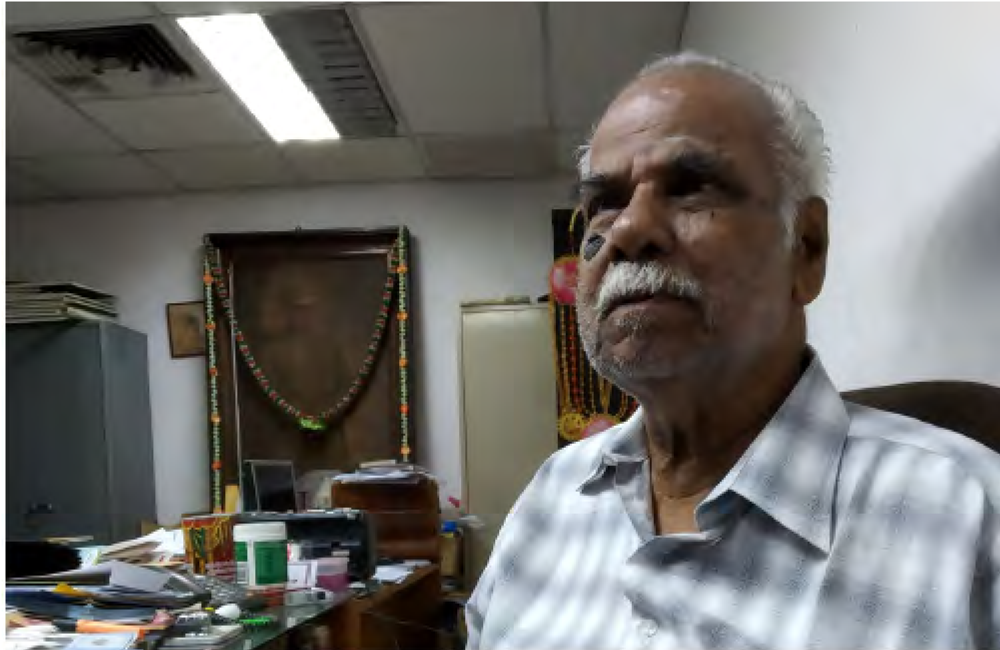
বিবেকানন্দ আশ্রম, কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া পর্ব)



পিয়োর লাইফ সোসাইটি, কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া পর্ব)



মালয়েশিয়ায় ভারতের হাই কমিশনার শ্রীমৃদুল কুমারের সঙ্গে লেখক (মালয়েশিয়া পর্ব)



বালক সেনা শ্রীনারায়ণ স্বামী, কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া পর্ব)



সেলাংগোর ক্রিকেট ময়দান, কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া পর্ব)



গ্রিন টাউনের গুরুদোয়ারা, ইপো (মালয়েশিয়া পর্ব)



বালিকা সেনা ডা. মাধুরী মজুমদার ও লেখক (মালয়েশিয়া পর্ব)



পেনাং ফ্রি স্কুল (মালয়েশিয়া পর্ব)



রয়্যাল হোটেল, ব্যাংকক (তাইল্যান্ড পর্ব)



সিলোপাকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংকক (তাইল্যান্ড পর্ব)



বালক সেনা তিলকরাজ পাওয়া, ব্যাংকক (তাইল্যান্ড পর্ব)



তাই-ভারত কালচারাল লজের আধিকারিকদের সঙ্গে লেখক (তাইল্যান্ড পর্ব)



চক্রপেট রোডের গুরুদোয়ারা, ব্যাংকক (তাইল্যান্ড পর্ব)



অধ্যাপক চিরাপত প্রপন্দবিদ্যা (তাইল্যান্ড পর্ব)



তাইল্যান্ড-মিয়ানমার সীমান্ত, মায়ে-সত (তাইল্যান্ড পর্ব)



পরিত্যক্ত রেল স্টেশন, মওলামাইন (মিয়ানমার পর্ব)



মওলামাইনের প্রাচীন জেলখানা (মিয়ানমার পর্ব)



মিটারগেজ ট্রেনে মওলামাইন থেকে ইয়াঙ্গনের পথে (মিয়ানমার পর্ব)



ওয়াও স্টেশন (মিয়ানমার পর্ব)



কানবে স্টেশন, ইয়াঙ্গন (মিয়ানমার পর্ব)



বাহাদুর শাহের সমাধি ক্ষেত্র, ইয়াঙ্গন (মিয়ানমার পর্ব)



প্রাক্তন ফৌজি শ্রী কে পেরুমল, কানবে বস্তি, ইয়াঙ্গন (মিয়ানমার পর্ব)



প্রাক্তন ফৌজি শ্রীকালিপ্রসাদ, জিয়াওয়াদি গ্রাম



এখানেই ছিল কানবে রিক্রুটমেন্ট সেন্টার, ইয়াঙ্গন (মিয়ানমার পর্ব)



নেতাজির বাংলো, মেইমিও (মিয়ানমার পর্ব)



রাজপ্রাসাদের একাংশ, মান্দালয় (মিয়ানমার পর্ব)



টামু-মোরে সীমান্তে লেখক (মণিপুর পর্ব)



মোইরাং গ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিস ঘর (মণিপুর পর্ব)



অধ্যাপক সুগত বসু এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুর সঙ্গে লেখক (মণিপুর পর্ব)

সিঙ্গাপুর পর্ব

১

কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর, সকাল ৫:৫০-এর ফ্লাইট। তাই কাকভোরের আগে শালিক বা চড়ুইভোর বলে যদি কিছু থাকে, সেই অদৈব প্রহরে এয়ারপোর্ট অভিমুখে বেরিয়ে পড়তে হল। চেক-ইন, ইমিগ্রেশন— সবই বেশ স্বচ্ছন্দে হয়ে গেল। দেখা গেল আমার চেক-ইন ব্যাগের ওজন ১০ কিলো এবং তার মধ্যে ৭ কিলো কেবল বইপত্র! ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি পাড়ায় পাড়ায় যদি থাকতে পারে, তবে সেই লাইব্রেরি পাঠকের পিঠে চেপে, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে না বেড়ানোরই-বা কী আছে! তবে এতদিন ধরে কলকাতা এয়ারপোর্ট হয়ে যাতায়াত করছি, আজই প্রথম আমাদের বিমানবন্দরের নাম একটা বিশেষ অর্থ বহন করল আমার কাছে। এই সদ্য, ১৯৯৫-এ দমদম বিমানবন্দর নামাঙ্কিত হয়েছে নেতাজির পরিচয়ে। কলকাতা বিমানবন্দরের উইকিপিডিয়া পেজে দেখা যায়, ১৯৩৮-এ নেতাজি তাঁর ইউরোপ সফরশেষে কেএলএমএ-র একটি বিমান থেকে এখানে নামছেন। তবে, ভাবতেও বেশ ভাল লাগে, প্রায় শতবর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে আমাদের এই বিমানবন্দর! ১৯২৪ সালে ডাচেরা আমস্টারডাম থেকে তাদের উপনিবেশ বাটাভিয়া (জাকার্তা) যাবার জন্য সেই প্রথম কলকাতায় একটা স্টপ-ওভার শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতা বিমানবন্দর মিত্রশক্তির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং জাপানি সেনাবাহিনীর ওপর লাগাতার বোমাবর্ষণ এবং মিত্রশক্তির সেনাদের নিয়মিত খাবার এবং অস্ত্র জোগানে এই কলকাতা বিমানবন্দর ছিল অপরিহার্য। এয়ার-পাওয়ারই যে বর্মার যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় নিশ্চিত করেছিল, সেবিষয়ে যুযুধান দু'পক্ষই ছিলেন একমত। ১৯৩৮-এ কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচন এবং তার এক বছরের মধ্যে দেশ জুড়ে এক অবিসংবাদিত জননেতায় পরিণত হওয়া থেকে মণিপুর-কোহিমার পশ্চাদপসরণ পর্যন্ত, নেতাজির সঙ্গে পরোক্ষভাবে হলেও জড়িয়ে আছে কলকাতা বিমানবন্দর। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তাই এক সার্থক নামকরণ। কুয়াশাভেজা কলকাতা ছেড়ে সঠিক সময়েই প্লেন ছেড়ে দেয়। ভাবি, এবারের যাত্রার আরম্ভটাও আক্ষরিক অর্থেই নেতাজিময়তায় আচ্ছন্ন থাকল!

আমার উড়ান বাজেট এয়ারলাইনে। তাই প্রায় চার ঘণ্টার আন্তর্জাতিক ফ্লাইট হলে কী হবে, বিনিপয়সায় ভাল-মন্দ খাবার পাবার কোনও আশা নেই। এমনটা হতে পারে আশঙ্কা ছিলই, তাই আগেভাগেই ঝোলায় একটা স্যান্ডউইচ ভরে রেখেছিলাম। ভাবখানা এরকম, প্লেন উঁচুতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দামও চড়বে— রাইজিং প্লেন-রাইজিং প্রাইস। তাই বলে আমাকে দিয়ে সেই উচ্চ মূল্যের বস্তু কেনানো যাবে না। আমার সঙ্গে একমত হল আমার সহযাত্রী। আমার পাশের সিটে বসা একটি কমবয়সি ছেলে। দেখেই মনে হয়েছিল বাঙালি। আন্দাজে ঢিল মারতেই লেগে গেল। জানা গেল নাম অনিমেষ দাস। বাড়ি বকখালির দিকে। সিঙ্গাপুরে চলেছে কাজে। জুরং বার্ড পার্কের পাশে কী এক বিশাল ঘরবাড়ি তৈরি চলছে, সেখানে ইনসুলেশনের কাজ করতে

চলেছে। থাকতে হবে টানা এক বছর। জানতে পারলাম ওদের সাইটে নাকি বেশ কয়েকশো বঙ্গসন্তান কাজ করেন। কলকাতার কোম্পানি নাকি? জিজ্ঞেস করায় উত্তর এল, তাইল্যান্ড। অনিমেষের কাছ থেকে সিঙ্গাপুরের এমআরটি (মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট), অর্থাৎ মেট্রো রেলের ভাড়ার হালহকিকত জেনে নিলাম। বিমানসেবিকা ঘোষণা করলেন, তাঁরা বাংলা, হিন্দি, মারাঠি এবং ইংরেজি বলতে পারেন। আমার চারপাশ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে এই চারটি ভাষার বাইরে কানে এল— নেপালি, মাড়ওয়ারি, গুজরাতি এবং তামিল। সিঙ্গাপুরে আমি প্রথম এসেছিলাম পনেরো বছর আগে, সিঙ্গাপুর মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের একটা কোর্স করতে। আর তারপর আসা ২০০৯-এ, অর্থাৎ ঠিক দশ বছর আগে। সেসময় সিঙ্গাপুর ডলার ছিল ভারতীয় মুদ্রায় তিরিশের কোঠায়, আর আজ তা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে দ্রুত উর্ধ্বগামী। স্বদেশের মুদ্রাস্ফীতির ধারাবাহিক বৃদ্ধির দুশ্চিন্তা ভুলে ভাবি, সিঙ্গাপুরে আমার হাতে মাত্র সাড়ে তিনদিন সময়। সময় নষ্ট না করে আজ থেকেই নেমে পড়তে হবে কাজে। যথাসময়ে আমাদের প্লেন ল্যান্ড করল চাঙ্গি বিমানবন্দরে। চারটে টার্মিনালের বিস্তারে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্ট এক বিশাল কর্মকাণ্ড। ২০১৭-তেই তার বার্ষিক যাত্রীসংখ্যা এক বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। পনেরো বছর আগে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন তাক লেগে গিয়েছিল এই এয়ারপোর্ট দেখে। এবার দেখলাম বৈভব আর চোখধাঁধানো আধুনিক টেকনোলজি। দেখে আর অবাক লাগে না। আমাদের দেশের বিমানবন্দর টার্মিনালগুলোও আজকাল বেশ আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠেছে, সেবিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই! তাই চোখ সয়ে গেছে।

এমআরটি-তে আড়াই সিঙ্গাপুর ডলার দিয়ে পৌঁছে গেলাম আমার গন্তব্য স্টেশন— লিটল ইন্ডিয়া। স্টেশন থেকে হাঁটা-দূরত্বে হস্টেল। আমার কৈশোর কেটেছে হস্টেলে। তবে এ হল ব্যাকপ্যাকার হস্টেল, অর্থাৎ ভবঘুরেদের আস্তানা। সস্তায় ডর্মিটরি এবং তৎসহ একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু আধুনিক সুযোগ-সুবিধার একই ছাদের তলায় সহাবস্থান। স্বাভাবিকভাবেই, সারা বিশ্বজুড়ে আজকাল এইসব হস্টেল খুব জনপ্রিয়। সিঙ্গাপুরের এই হস্টেলের নাম ক্যাম্পবেল ইন। চেক-ইন করে ঘরে ঢুকতেই আমার গরিব রথ এক্সপ্রেসের বগির কথা মনে পড়ে গেল। সেই এক মুড়ির টিন ভরার পদ্ধতি এখানেও প্রয়োগ হয়েছে বোঝা গেল। মনে মনে এই হস্টেলের নাম রাখলাম ক্র্যাম্পবেল ইন। কিন্তু হস্টেলের হসপিটালিটি এবং হস্টিলিটি নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। এই শহরে ছড়িয়ে থাকা নেতাজির স্মৃতিবিন্দুগুলি ছোঁয়া শুরু করতে হবে আজ থেকেই। তাই ব্যাগ-বস্তা রেখে আবার এমআরটি। এবার গন্তব্য ধোবি ঘাট স্টেশন। ঠিকই পড়েছেন। ধোবি ঘাট। সিঙ্গাপুরের মতো কসমোপলিটান শহর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বিশেষ করে ভারতীয়, চিনা এবং মালয় ভাষা ও সংস্কৃতি কখন যে সন্তর্পণে এদেশেরও সংস্কৃতি হয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। এমআরটি-র সব ঘোষণাই এখানে চারটি ভাষায় করা হয়। ইংরেজি-চাইনিজ়-মালয়-তামিল, এই ক্রমানুসারে। বেশ কয়েক জায়গায় বাংলাতেও নোটিস লাগানো— অকারণে ঘোরাফেরা/ভিড় করবেন না। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই ধরনের নোটিস কিন্তু কেবল তিনটি ভাষায় লেখা— ইংরেজি, তামিল এবং বাংলা। চাইনিজ় কিংবা মালয়রা সম্ভবত অকারণ ঘোরাফেরা এবং অযথা ভিড় করেন না। কিংবা তামিল এবং বাঙালিরাই এই কাজটি বেশি করে থাকেন।

প্রতিটি এমআরটি স্টেশনের ভিতরে ও প্রবেশপথে সেই এলাকার একটা ম্যাপ থাকে। ধোবি ঘাট স্টেশনে নেমেই প্রথম কাজ ছিল সেই ম্যাপ দেখা। দেখলাম স্টেশন থেকে দু'পা হাঁটলেই আমার সেদিনের প্রথম

গন্তব্যস্থল। ক্যাথে থিয়েটার। প্রথম দর্শনে চিনতে পারিনি। আমি আসলে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম বইয়ের পাতায় দেখা সেই পুরনো ছবি। ক্যাথের সব পুরনো ছবিতেই দেখেছিলাম, অনেকটা আমাদের কলকাতার সেই মেট্রো সিনেমার মতো তার বাইরের গড়ন, তথা ফ্যাসাড। কিন্তু এখন দেখছি সেখানে দাঁড়িয়ে এক অট্টালিকা। দি ক্যাথে— লেখাটাই কি তার ঐতিহ্যের একমাত্র পরিচায়ক আজ? এই ভেবে রাস্তা পার হয়ে একটু এগোতেই দেখি সেই পুরনো প্রবেশপথ আজও অপরিবর্তিত। সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত শিহরন হয় আমার মধ্যে। এই সেই ক্যাথে হল, যেখানে ৪ জুলাই ১৯৪৩, নেতাজির হাতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতৃত্ব তুলে দেন রাসবিহারী বোস! এই সেই ক্যাথে হল, যেখানে ২১ অক্টোবর ১৯৪৩-এ আজাদ হিন্দ সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ এবং মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের পর নেতাজি নিজে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, নিজেকে সামলে রাখতে পারছিলেন না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক মানচিত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এই ক্যাথে হল, আজ এক শপিং মল। ভিতরে ঢুকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হেঁটে বেড়াই অনেকক্ষণ। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাই নেতাজির কণ্ঠ— আমি সুভাষচন্দ্র বসু ঈশ্বরের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য স্বাধীনতার এই পুণ্য সংগ্রাম পরিচালনা করে যাব!

২

ক্যাথে হলের মলত্ব প্রাপ্তির দুঃখ বুকে নিয়েই আবার ট্রেনে চাপি। এবার গন্তব্য সিটি হল স্টেশন। তবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দোর্দণ্ডপ্রতাপের এই সময়েও, ঐতিহ্যশালী বাড়িগুলিকে সিঙ্গাপুরের সরকার যেভাবে রক্ষা করে চলেছেন তা শিক্ষণীয়। ঐতিহ্যের প্রতি সিঙ্গাপুর যত্নশীল বলেই ক্যাথের প্রবেশপথ এবং তোরণ আজও অপরিবর্তিত। ঐতিহ্যময় বাড়ি বাঁচাতে অর্থের প্রয়োজন, আর সেই অর্থ জোগান দেবে ক্রেতা। অতএব বানাও মল। তবে ঐতিহ্যশালী ফ্যাসাডটি যখন রাখাই হল, তখন তার সামনে একটা ফলকে এই বাড়ির ইতিহাস দু'কলম লেখা থাকলে সম্ভবত ইতিহাসকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হত। তবে সিঙ্গাপুর পররাষ্ট্র, তারা গায়ে পড়ে আমাদের ভারতের ইতিহাস সংরক্ষণ করতে যাবেনই-বা কেন? এ বিষয়ে ভারত সরকার এবং সিঙ্গাপুর প্রবাসী ভারতীয়রা যদি একত্রে সিঙ্গাপুর হেরিটেজ ট্রাস্টকে অনুরোধ করতেন, তা হলে সম্ভবত কাজ হত।

ধোবি ঘাট, সিটি হল, র‍্যাফেলস, বুগিস, অর্চার্ড রোড— সিঙ্গাপুরের এইসব এলাকার বেশিরভাগ এমআরটি স্টেশনগুলোও আবার এক-একটা শপিং মলের এক্সটেনশন। আক্ষরিকভাবেই আকাশ থেকে পাতাল তাদের বিস্তার। মনে করুন, ট্রেন থেকে নামলেন, তারপর প্ল্যাটফর্ম থেকে এক বা একাধিক চলমান সিঁড়ির স্তর, উঠতে না উঠতেই ঢুকে পড়বেন শপিং মলে। তারপর উইন্ডো শপিং, ফুড কোর্ট হপিং করতে করতে দেখলেন হয়তো পৌঁছে গেছেন আর এক শপিং মলে। এই জন্যই বলা হয় সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিনোদন হল শপিং। যাই হোক, আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে, সিটি হল স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হতেই সিঙ্গাপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব। মনে পড়ে, এখানেই সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত পর্বতারোহী ডেভিড লিমের সঙ্গে

প্রথমবার দেখা করার কথা। পনেরো বছর আগে, কিন্তু মনে হয় এই সেদিন! রিক্রিয়েশন ক্লাবকে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিতেই চোখের সামনে দেখা দেয় পাদাং— সিঙ্গাপুরের পার্লামেন্ট ভবনের সামনের সেই ঐতিহাসিক ময়দান। দেখি পাদাং-এর মাঝখান দিয়ে একফালি সরু পায়ে-চলা পথ বার করা হয়েছে। আর তার অন্যপ্রান্তে সিঙ্গাপুর ক্রিকেট ক্লাব। সবুজ ঘাসের গালিচার একটা দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই টাউন হল, নেতাজি সংক্রান্ত বহু বইতে এবং কলকাতায় নেতাজির বাসভবনের মিউজিয়ামেও এই বাড়ি এতবার দেখেছি যে মনে হয় না নতুন কিছু দেখছি। মাঠ পার হয়ে টাউন হলের সেই সিঁড়িতে উঠে আসি। কল্পনা করার চেষ্টা করি ৫ জুলাই, ১৯৪৩-এর সেই দিন। নেতাজি দাঁড়িয়ে আছেন এই সিঁড়িতেই। আর গোটা মাঠ জুড়ে কুচকাওয়াজ করছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা। নেতাজি স্যালুট গ্রহণ করছেন, আর বলছেন, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন! নেতাজি সেদিন যা বলেছিলেন তাতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেখানে জমায়েত পঞ্চাশ হাজারের বেশি ভারতীয় সৈন্য। হাতের রাইফেল আকাশে তুলে তারা নেতাজিকে সম্মান জানিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন নেতাজি। উনি বলেছিলেন, ‘if you follow me in life and in death, as I am confident you will, I shall lead you to victory and freedom.’ এখানে দাঁড়িয়েই নেতাজি বলেছিলেন, চলো দিল্লি! সন্ধে নামছিল, গুমট আকাশ পাদাং-এর ঘাস ছুঁয়ে যাচ্ছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে। সবুজ মাঠ আর সেই সার সার থামওলা টাউন হলকে পিছনে ফেলে আমি হাঁটছিলাম ব্রাস বাসা রোড ধরে। এই রাস্তা ধরেই একদিন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যেত রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট। কাছেই ওয়াটারলু স্ট্রিটে ছিল রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের ব্যারাক। মাঝেমধ্যেই পরিদর্শনে আসতেন নেতাজি। সারা বিকেল আর সন্ধে পাদাং-সিটি হল-ক্যাথে-ওয়াটারলু স্ট্রিট হেঁটে বেড়িয়ে, কিছু মনখারাপ নিয়েই ফিরে এলাম আমার হস্টেলে। ওয়াটারলু স্ট্রিটের রানি ঝাঁসি ব্যারাকের কোনও অস্তিত্বই আর নেই!

পরদিন সকাল হতেই, ক্যাম্পবেল ইন আমাকে জানাল যে ওদের পক্ষে আমাকে ধারণ করা আর সম্ভব হচ্ছে না; কারণ ওদের হাউস ফুল। তাই আরও একদিনের বুকিং থাকা সত্ত্বেও ওরা আমাকে অন্য আর এক হস্টেলে পাঠানোর জন্য সব ব্যবস্থা করে দিল। আমিও ক্যাম্পবেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার এই সুযোগ হাতছাড়া না করে পত্রপাঠ ব্যাকপ্যাক পিঠে তুলে নিলাম। কয়েকশো মিটার দূরেই পেরাক রোডে আমার এই নতুন হস্টেলের নাম দেখলাম ফুটপ্রিন্টস এবং প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল ক্যাম্পবেলের তুলনায় এ তো স্বর্গ! রিসেপশনে ব্যাগ রেখে, পরে চেক-ইন করব জানিয়ে আবার ছুট। এবার গন্তব্য বার্টলে রোডে রামকৃষ্ণ মিশন। দশ বছর পর আবার বার্টলে রোডের আশ্রমে এসে মনে হল যেন সব একইরকম রয়েছে। আশ্রমের প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী সমচিত্তানন্দজির সঙ্গে দেখা করতেই যেন মনে হল ঘরে ফিরে এসেছি। কৈশোরের সহপাঠী সৌম্য বর্তমানে কর্মসূত্রে সিঙ্গাপুর প্রবাসী। সেও মহারাজকে আমার আসার কথা অগ্রিম জানিয়ে রেখেছিল। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, তাই মহারাজ প্রসাদ পেতে বললেন। প্রসাদের এখানে বেশ অভিনব ব্যবস্থা। একটা আয়তাকার কাগজ হল থালা। তার ওপরই সব খাবার পরিবেশন হল। কাগজটাও অভিনব, খাবারের ঝোল-জল চট করে শুষে নেয় না। প্রসাদের মেনুও বলার মতো— ব্রোকলি সহযোগে স্যালাড, মাশরুম, ভাত, রসম এবং ঘোল। কন্টিনেন্টাল এবং দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের এরকম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভবত সিঙ্গাপুরেই সম্ভব।

প্রসাদ খাবার পর প্রেসিডেন্ট মহারাজ আমার পরিকল্পনার কথা শুনলেন এবং বললেন, জানো তো এই আশ্রমে অনাথ শিশুদের জন্য যে বয়েজ় হোম দেখছ তার উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং নেতাজি? এই বলে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর অফিসে। সেখানে দেওয়ালে আজও রয়েছে সেই উদ্বোধনের দিনের গ্রুপ ছবি। নেতাজি বসে আছেন তাঁর সেনাপতির ইউনিফর্মে। গলায় মালা। পাশে বসে আছেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী ভাস্বরানন্দ। ছবির সঙ্গে একই ফ্রেমে রয়েছে সেদিনের *আজাদ হিন্দ পত্রিকার* একটি ক্লিপিং। সেই খবরের টুকরো থেকেই জানা যায়, নেতাজির অনুরোধে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ তিরিশ হাজার ডলার দান করেছিল এই অনাথ আশ্রম নির্মাণে। বয়েজ় হোমের ডর্মিটরি উদ্বোধন করে নেতাজি রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবা এবং ভারতবাসীর সার্বিক উন্নয়নে অবদানের কথা বলেছিলেন। সেই খবরের ক্লিপিং-এ আরও জানা যায়, ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের অনুদান ছাড়াও নেতাজির অনুরোধে সেদিনই আরও উনচল্লিশ হাজার ডলার এবং দুটি সোনার বালা উপস্থিত ভারতীয়রা মিশনকে দান করেন।

অফিসে এই ছবি দেখানোর পরে মহারাজ আমার আলাপ করিয়ে দিলেন শ্রীমতী মীরা চ্যাটার্জির সঙ্গে। বললেন, উনিই শ্রীমতী বীণা চ্যাটার্জির কন্যা। বীণা চ্যাটার্জি এবং তাঁর পরিবার সম্পর্কে কৃষ্ণা বসুর বইতে আগেই পড়েছিলাম। আজ এভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় হাতে চাঁদ পেলাম। নেতাজি সিঙ্গাপুরে এসে দেশের কাজে সমস্ত ভারতবাসীকে জীবন উৎসর্গ করার ডাক দেবার পর শয়ে শয়ে ভারতীয় পরিবার— বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন— সবাই মিলে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজে কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে পড়েন। শ্রীমতী বীণা চ্যাটার্জি ছিলেন তেমনই এক পরিবারের সদস্যা। আজ তাঁর কন্যার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হল। শ্রীমতী মীরা চ্যাটার্জি, আমাকে একেবারেই হতবাক করে দিয়ে তাঁর মায়ের সংগৃহীত সেই সময়ের নিউজ় পেপার ক্লিপিং-এর সফট কপিগুলি আমাকে দেখালেন। বললেন, এইসবই কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো এবং সিঙ্গাপুরের ভারতীয় হাই কমিশনকে মা দান করে গেছেন। ব্রিটিশ অকুপেশনের সময় বহু ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করা এইসব অমূল্য দলিল আমি এভাবে দেখতে পাব ভাবিনি! এরপর শোনালেন, সিঙ্গাপুর হেরিটেজ বোর্ড-কে দেওয়া তাঁর মায়ের ইন্টারভিউ। বললেন, তাঁর কাকা বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির কথা, তিনিও ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে। প্রাণ হারিয়েছিলেন বর্মা সীমান্তে চিন্ডুইন নদী পার হতে গিয়ে। কিছুতেই একটা ছবি তুলতে রাজি হলেন না মীরাদিদি। বৃষ্টি আসছে দেখে আমার হাতে একটা ফোল্ডিং ছাতা ধরিয়ে দিলেন। আশ্রম ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগছিল না, মন ভরে গিয়েছিল অযাচিত প্রাপ্তির আবেশে।

৩

শ্রীমতী মীরা চ্যাটার্জিকে বিদায় জানিয়ে আশ্রম থেকে বেরনোর পথেই দেখা হয়ে গেল পার্থ মহারাজের সঙ্গে। পার্থ মহারাজ, অর্থাৎ স্বামী সত্যলোকানন্দ জন্মসূত্রে জাপানি হলে কী হবে, দীর্ঘদিন বেলুড় মঠে থাকার সুবাদে বাংলা বলেন সাবলীল। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজির সেবক এবং সেক্রেটারি থাকার সময় থেকেই আমার সঙ্গে এক অদ্ভুত সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পার্থ মহারাজের। সে সম্পর্ক ছিল অনেকটাই দাদা এবং ভাইয়ের। আমি সিঙ্গাপুর আসছি একথা উনি জানতেন না। যদিও আমি জানতাম পার্থ মহারাজ এখন সিঙ্গাপুর আশ্রমেই

আছেন, আমি কোনও আগাম যোগাযোগ করার চেষ্টাই করিনি। ওঁকে সারপ্রাইজ় দেবার একটা চাপা ইচ্ছে আমার ছিল। আজ এভাবে মুখোমুখি হয়ে যেতে আমার সেই দুষ্টু বুদ্ধি সফল হল। হনহন করে হেঁটে আশ্রম-অফিসের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, আর আমি দূর থেকে ওঁকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কাছে এসেই থমকে গেলেন। সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি মনে মনে দুই গোনার আগেই মুচকি হেসে বললেন— অনিন্দ্য! এত স্বাভাবিক সেই স্বর যে মনে হল যেন গতকালই শেষ দেখা হয়েছিল! মহারাজকে অবাক করতে গিয়ে আমি নিজেই হতবাক হয়ে গেলাম। আমাকে উনি কতটা স্নেহ করেন তা আবার অনুভব করলাম।

আমার সিঙ্গাপুরে আগমনের উদ্দেশ্য বলতেই দেখলাম ওঁরও এ ব্যাপারে মহা উৎসাহ। বললেন, এসপ্ল্যানেড পার্ক গিয়েছ? ওখানে আইএনএ মেমোরিয়াল রয়েছে। আর আমাদের পুরনো আশ্রমেও তো তোমাকে একবার যেতে হবে। ওখানেই তো নেতাজির নিত্য আসা-যাওয়া ছিল। আমি সে-কথা জানি শুনেই বললেন, দাঁড়াও, গুগল করে তোমাকে রাস্তাটা একবার বুঝিয়ে দিই, তা হলে তোমার বাড়িটা খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। বলেই, পার্থ মহারাজ ফোন ঘেঁটে নরিস রোডের স্ট্রিট ভিউ খুঁজতে থাকলেন। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, নেতাজিকে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তাৎপর্যবিহীন কিংবা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করার জন্য একটি বিপুল ক্ষমতাশালী শ্রেণির এতদিনের প্রয়াস এবং দেশবাসীর অধিকাংশের বিস্মরণ-বিলাস এই জন্যই ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে চলেছে। দেশ-কাল-পাত্র পার করে তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা কোনওদিনই কোনও ভ্যানিশিং অ্যাক্টে অদৃশ্য করা যাবে না। বাড়ির ছবি দেখিয়ে মহারাজ বললেন, আশ্রমের হাত থেকে এই বাড়ি এক অ্যাংলিকান চার্চ কিনে নিয়েছে সেই ১৯৮৩-তে। তবু যেহেতু হেরিটেজ বিল্ডিং তাই তার বাইরেটা তারা বদলাতে পারেনি। গিয়ে দেখো তোমাকে ভিতরে ঢুকতে দেয় কি না! মহারাজের কাছে গুগল স্ট্রিট ভিউ এবং এমআরটি স্টেশন বুঝে নিয়েই দৌড় লাগালাম।

৯ নম্বর নরিস রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের পুরনো সেই বাড়ি খুঁজে পেতে একেবারেই সমস্যা হল না। উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যের ধাঁচে তৈরি সেই বাড়ির গা-ঘেঁষে আজ এক রেস্তরাঁ— বড় বড় করে লেখা— অল ইন্ডিয়া রেস্তরাঁ— ভেজ অ্যান্ড নন ভেজ। বাড়ির মুখ আজও অবিকৃত তবে অ-বিক্রীত নয়। পাঁচিলের ওপর বেমানান গ্লো-সাইনে লেখা— কিং অফ গ্লোরি। বাড়ির সামনে হেরিটেজ বিল্ডিং সম্পর্কিত ফলকে লেখা— ১৯৩২-এ রামকৃষ্ণ মিশন এখানে প্রথম আসে এবং প্রতিষ্ঠা হয় বিবেকানন্দ তামিল স্কুল। ১৯৩৮ থেকে সারদা দেবীর নামে মেয়েদের স্কুলও চালু হয়। ১৯৮২-তে কৃষ্ণা বসু যখন এখানে এসেছিলেন তখনও এই বাড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের ছিল। ১৯৮৩-তে এশিয়ান উইমেনস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বাড়িটি কিনে নেন — আজকের অ্যাংলিকান চার্চ তারই উত্তরাধিকার। বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। ভাবি একবার ভিতরে না গেলেই নয়। কলিং বেল বাজাতেই এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে আসেন। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চাওয়ার ইচ্ছাটা বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়। বিশিষ্ট এক ইতিহাসের প্রতি বিশুদ্ধ আগ্রহ জাতীয় কথা বিশেষ কাজ করে না। একবার শুধু ভিতরটা দেখব— এই অনুরোধ শেষ পর্যন্ত জিতে যায়। ভদ্রমহিলা আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে সম্মত হন। দেখি ভিতরটা একটা বড়সড় হলঘর গোছের। তার একপাশে একটা ছোট প্ল্যাটফর্ম এবং তার ওপর একটা ছোটখাটো অর্কেস্ট্রার সাজসরঞ্জাম ছড়ানো। এখানে মিউজ়িক ক্লাস হয়, বলেন ভদ্রমহিলা, একটু সাবধানি স্বর। ঠিক কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই লোকটার এখানে উদয় তা

স্বাভাবিকভাবেই এখনও পরিষ্কার নয় তাঁর কাছে। আমি বুঝতে পারি, এটাই ছিল আশ্রমের লেকচার রুম। এখানে নেতাজি স্বয়ং বক্তৃতা করে গেছেন। দেখি একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। উপরে যাওয়া যাবে? প্রশ্ন শেষ হবার আগেই গুরুতর ঘাড় নেড়ে সেটা যে অসম্ভব তা জানিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা এবং বুঝলাম এবার কেটে পড়াই শ্রেয়। তবে এটাও জানতাম যে ওই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই ছিল আশ্রমের পূজার ঘর। আবিদ হাসানের লেখায় জানা যায়, যুদ্ধের সময় নেতাজি সিঙ্গাপুরে থাকলে মাঝেমাঝেই গভীর রাতে চলে আসতেন এই নরিস রোডের আশ্রমে। সেনাপতির ধরাচুড়ো ছেড়ে পরে নিতেন সাদা সিল্কের ধুতি। বসতেন ধ্যানে। আবার রাত থাকতেই ফিরে যেতেন তাঁর মেয়ার রোডের বাড়িতে।

আজ বেরিয়ে যাবার সময়, দরজার চৌকাঠে পা রেখে মনে হল আরও এক ঐতিহাসিক বাড়ি হারিয়ে যেতে চলেছে বিস্মৃতির অতলে। ভাবছিলাম, এই আশ্রমেই একসময় ছিলেন ব্রহ্মচারী কৈলাসম। নেতাজির সঙ্গে এক বিশেষ সখ্য গড়ে উঠেছিল তাঁর সেই যুদ্ধের সময়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন বর্মার সীমান্ত পার হয়ে মণিপুরের দিকে এগোচ্ছে, সেসময়ও দেখা যায় নেতাজি চিঠি লিখেছেন ব্রহ্মচারী কৈলাসমকে। ১৯৪৪-এর অক্টোবরে, এমনই এক চিঠিতে নেতাজি লিখেছিলেন— জয় হিন্দ— আমি ভাল আছি, এই জানাতে আজ এই এক লাইন লিখছি। ফ্রন্টে সেনাবাহিনীর ইনস্পেকশন সেরে এই সবে ফিরে এসেছি।

৪

পার্থ মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, পুরনো আশ্রমেই যখন যাচ্ছ তখন প্রাচীন কালীমন্দিরটিও দেখে নিয়ো। একদম কাছেই। আমার মাথায় ছিল এক চেট্টিয়ার মন্দিরের কথা। নেতাজি সিঙ্গাপুরে থাকার সময় যে মন্দিরে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল। পার্থ মহারাজের প্রাচীন কালীমন্দিরই কি ইতিহাসে পড়া সেই চেট্টিয়ার মন্দির? যাচাই করার একটাই উপায় ছিল— গো টু কালীমন্দির। নরিস রোড থেকে একটু হাঁটতেই লিটল ইন্ডিয়ার সেই পরিচিত রাস্তায় এসে পড়লাম। ভিড় ঠেলে মন্দিরের সামনে পৌঁছতেই দেখলাম একটা ফলকে লেখা— ভীরমাকালিআম্মান টেম্পল এবং তার নীচের কয়েক লাইন পড়তেই বুঝলাম— এই সেই মন্দির!

গোটা রাস্তা তাইপুসম উৎসবের আনন্দে সেজে উঠেছিল। একঝলক দেখলে এটা যে ভারতের বাইরে কোনও দেশ, তা বোঝার সাধ্য ছিল না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নাকি সিঙ্গাপুরে এটা একটা জাতীয় ছুটির দিন ছিল। তবে, তাইপুসম এখন আর ন্যাশনাল হলিডে না হলেও মানুষের ঢল নেমেছিল প্রতিবারের মতোই। তাইপুসমের সঙ্গে দেবাসুরের যুদ্ধের একটা কাহিনি প্রচলিত আছে। অসুরদের কাছে যুদ্ধে গো-হারা হেরে যাবার পর দেবতারা শিবঠাকুরের পায়ের তলায় বসে খুব কান্নাকাটি করতে থাকেন। দেবগণের এই ঘোর দুর্দিনেই নাকি দেবী পার্বতী মুরুগনকে একটি বর্শা দিয়েছিলেন। বর্শা দেবপক্ষে যাবার পর কী হয়েছিল নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজও তাই অগণিত ভক্ত খালি পায়ে হেঁটে চলেছেন এই কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে। কারও মাথায়, কারও বাঁকে দুধের কলসি। তাঁদের কেউ ভাবছেন এবার ওই অসুর বাড়িওলার আর রক্ষে নেই, হাইকোর্টের মামলায় আমার জয় সুনিশ্চিত। আবার কেউ হয়তো ভাবছেন, এইবার ওই অসুর ডেপুটি ম্যানেজার রামলিঙ্গমকে লেঙ্গি মেরে আমার ছেলের জেনারেল ম্যানেজার হওয়া আটকায় কে?

আসলে দেব-অসুরের ব্র্যান্ডিং এবং সুবিধামতো সামাজিক প্রয়োগ ব্যাপারটা যে এক শ্রেণির মানুষ তাঁদের প্রয়োজনে চিরকাল করে এসেছেন তা আজ কারও অজানা নেই। এদিকে, আরও যাঁরা কড়া ভক্ত, তাঁরা নিজেদের গায়ে লোহার শিক বিঁধিয়ে, অনেকটা যেন চলমান শরশয্যার মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। এই চলমান শরশয্যাদের ঘিরে রেখেছেন ঘনিষ্ঠজনেরা। তাঁরা গান গাইছেন, নাচছেন। ভক্তিভাবের বন্যা বইছে আর রাস্তার ধারে অগণিত চিনা, মালয় এবং ইউরোপিয়ান টুরিস্ট হাঁ করে এই বিচিত্র মিছিল দেখছে— বিনা পয়সায় এরকম এক্সোটিক সার্কাস দেখার সুযোগ কে ছাড়তে চায়! আজকের এই মানুষের ঢল দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসের একটা দিনের কথা। সেদিনও মানুষের ঢল নেমেছিল এখানে, এই মন্দির প্রাঙ্গণে। তবে সেদিনের মুরুগন ছিলেন আমাদের নেতাজি!

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, নেতাজি কেবল জাতি-ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে প্রবাসী ভারতীয়দের একজোট করেই থেমে থাকেননি। আন্দোলনের সুপ্রিম কম্যান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সিদ্ধান্ত থেকে সৈনিকদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় যে-কোনও কাজই যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেটা নিজে খেয়াল রাখতেন। সেই জন্যই তিনি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন নেতাজি— একজন সর্বাঙ্গীণ অভিভাবক এবং আক্ষরিক অর্থেই একজন জননায়ক। যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে একটি সেনাদল চালাতে গেলে প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই অর্থসংকুলানের কাজও নেতাজি অবলীলায় করতেন। মালয়েশিয়ার পেনাং-এ ১৯৪৩-এর আগস্ট মাসে, পনেরো হাজার ভারতীয়ের এক সমাবেশে, নেতাজির বক্তৃতা শুনে মানুষ কুড়ি লক্ষ মালয় মুদ্রা (সেসময় বলা হত স্ট্রেটস ডলার) দান করেছিলেন। মালয় প্রবাসী ভারতীয়রা নেতাজির নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। নেতাজির অনুপ্রেরণায় বহু কোটিপতি ভারতীয় তাঁদের সবকিছু আজাদ হিন্দ ফৌজকে দান করে একদিনে ফকির হয়েছিলেন— এমন উদাহরণ কম নেই। এইরকম এক পটভূমিকায় সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার মন্দিরের পুরোহিতরা এলেন নেতাজিকে তাঁদের মন্দিরের এক সমাবেশে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাতে। নেতাজি মালয় উপমহাদেশে পা রাখার পর থেকেই চেট্টিয়াররা ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সেদিন পুরোহিতদের আমন্ত্রণ নেতাজি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। বললেন, যে মন্দিরে জাতপাত এবং ধর্ম বিচার করা হয়, সেখানে আমার পক্ষে দেশের কথা বলা সম্ভব হবে না। আমি যেতে পারি যদি আপনারা সেদিন মন্দিরের দরজা সমস্ত ধর্মের এবং জাতের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তবেই সেটি হয়ে উঠবে এক যথার্থ ভারতীয় জনসমাবেশ। নেতাজির এই কথায় প্রথমে স্তম্ভিত হলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন মন্দির-কর্তারা। ২৫ অক্টোবর ১৯৪৩, হয়েছিল সেই চেট্টিয়ার মন্দিরের সমাবেশ।

মন্দিরের দোরগোড়ায় যখন নেতাজি পা রাখলেন তখন তাঁর একপাশে আবিদ হাসান এবং অন্যপাশে মহম্মদ জামান কিয়ানি। পরের ঘটনা লিখে গেছেন নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবিদ হাসান। আবিদ হাসান লিখছেন— নেতাজিকে নিয়ে আমরা মন্দিরে পৌঁছে দেখি গোটা মন্দিরচত্বর ভরে গেছে মানুষে— বেশি করে চোখে পড়ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির উর্দি আর কালো টুপি পরা দক্ষিণ ভারতীয় মুসলিমদের মাথা। মন্দিরের ভিতরের উঠোনে ঢোকার সময় একটু ইতস্তত করছিলাম, এমন সময় এক পুরোহিত আমাকে মৃদু ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিলেন পুরোহিতরা। নেতাজি সেদিনের সমাবেশে বলেছিলেন, আমাকে আপনাদের সমাজের ধনী ব্যবসায়ীরা জিজ্ঞাসা করছেন— টোটাল মোবিলাইজেশনে আমাদের কীরকম দান করতে হবে— ১০ না ৫ পারসেন্ট? আমি কি আমার

জওয়ানদের বলব যে দেশের জন্য তোমরা ১০ বা ৫ শতাংশ রক্ত ঝরিয়ো? সেদিন নেতাজিকে এক রুপোর তরোয়াল উপহার দিয়েছিলেন মন্দির কমিটি। মন্দির থেকে বেরিয়ে নিজের কপালের তিলক মুছে ফেলেছিলেন নেতাজি— আর তাঁর দেখাদেখি আমরাও।

৫

নেতাজিকে দেওয়া চেট্টিয়ার মন্দিরের সেই রুপোর তরোয়াল আজ কোথায় আছে তা কারও জানা নেই। সেটা ভাবলে আজ একটু মন খারাপ হয় বইকী! তবে মন খারাপ ব্যাপারটায় আমাদের এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা। কারণ, কোহিনুর থেকে ময়ূর সিংহাসন— কে নিয়েছে, কোথায় আছে জানা থাকা সত্ত্বেও তা দেশে ফিরেছে কি? ব্রিটেন চিরকাল বলে এসেছে ভারতে উপনিবেশ গড়াটা তাদের একদমই লাভজনক হয়নি, উপরন্তু ভারতের রাস্তাঘাট বানাতে গিয়ে ওঁদের রাজকোষের নাকি বেশ ক্ষতিই হয়ে গেছে। এদিকে উৎসা পট্টনায়কের একেবারেই সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৮— এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেন ভারত থেকে ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার তাদের দেশে নিয়ে গেছে। আজকের হিসেবে এই টাকাটা ব্রিটেনের বার্ষিক জিডিপি-র ১৭ গুণ! চেট্টিয়ার মন্দিরের এই তরোয়াল খুব সম্ভবত সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ রি-অকুপেশনের পর তাদের হস্তগত হয় এবং তা আজ বিলেতের কোনও প্রাইভেট কালেক্টরের বসার ঘরের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। বিশ্বের ইতিহাস চিরকাল বিজয়ীরাই লেখেন। আর সেই ইতিহাস পড়তে এবং বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় তার পরের বেশ কয়েক প্রজন্ম। আমরা যদি দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন ইনকা সভ্যতার দিকে তাকাই তা হলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারব। ১৫৩২-এ স্প্যানিশ কনকিস্তাদোররা যখন পেরুর ইনকা সভ্যতা এক কথায় পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেয়, তখন তাদের অস্তিত্বও হারিয়ে যায়। কিন্তু ইনকাদের ইতিহাস ছিল মৌখিক উত্তরাধিকার। তাই কনকিস্তাদোররা মুছে দিলেও সেই ইতিহাস আজও বেঁচে আছে। আজ নতুন প্রজন্মের গবেষকদের সাধনায় তাই সম্ভব হয়েছে ইনকাদের ইতিহাস নতুন করে লেখার। সত্য চাপা দেওয়া যায়, বিকৃত করা যায় কিছুদিনের জন্য— চিরকালের জন্য নয়। সময়ই শেষ কথা বলে। তাই আমার মনে হয়— ইট, কাঠ, পাথর, হারিয়ে-যাওয়া সম্পদের স্মৃতিচারণের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল নেতাজির জীবন এবং তাঁর কাজের সঠিক অনুধাবন এবং মূল্যায়ন। মৃত্যুরহস্য কিংবা বিবাহ নয়, তাঁর কাজ-ই হওয়া উচিত আমাদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। তবেই হবে নেতাজির উত্তরাধিকারের সঠিক স্বীকৃতি। আজাদ হিন্দ ফৌজের লিখিত ইতিহাস অত্যন্ত কম হলেও— রয়েছে। নেতাজির সেনাপতিরা এবং অনেক সৈনিকও তাঁদের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমাদের কাজ হল সেই স্মৃতিগুলিকে একত্র করে, বর্তমানের পটভূমিকায় তাদের যাচাই করে এক নির্ধারক সত্যে পৌঁছনো। সেই কাজেই আমি আমার মতো করে নেমেছি।

পিছনে পড়ে থাকে তাইপুসমের ভক্তিরসে ভেজা কোলাহল। আমি ছুটি এসপ্ল্যানেড পার্ক। আবার সেই এমআরটি। সিটি হল স্টেশনে নেমে, পাদাং পার হয়ে পৌঁছে যাই আইএনএ মেমোরিয়াল। একসময় এই জায়গাটা ছিল একেবারে সমুদ্রের পাশে। জাপান সারেন্ডার করেছে এই খবর পাবার পরই নেতাজি কর্নেল স্ট্রেসি নামের এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অফিসারকে শহিদদের স্মৃতিতে একটি সৌধ তৈরির দায়িত্ব দেন। সৌধের মডেল বাছাই করে দিয়ে নেতাজি বলেছিলেন, শত্রুপক্ষ ল্যান্ড করার আগেই কাজ শেষ করতে হবে।

পারবে কি? স্ট্রেসি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই। স্ট্রেসি কথা রেখেছিলেন। অজানা যোদ্ধাকে উৎসর্গ করা সেই সৌধে লেখা ছিল তিনটি উর্দু শব্দ— ইত্তেফাক (একতা), ইতমাদ (বিশ্বাস) এবং কুরবানি (আত্মত্যাগ)। ব্রিটিশ সেনা সিঙ্গাপুরে ল্যান্ড করার পর তাদের প্রথম কাজ ছিল এই সৌধকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া। এই ঘটনার ভিডিয়ো আজও কলকাতায় নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোয় গেলে দেখা যাবে। ব্রিটিশ বীরপুঙ্গবদের এই কাপুরুষোচিত কাজ সারা বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাসে এক কলঙ্ক। জয়-পরাজয় নির্বিশেষে, মৃত সৈনিকের প্রতি উৎসর্গিত সৌধ ধ্বংস করার এমন নজির আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। আসলে ১৯৪২-এ সিঙ্গাপুরে জাপানিদের কাছে পর্যুদস্ত হওয়াটা এতটাই লজ্জাজনক ছিল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে যে যুদ্ধের ন্যূনতম নীতিবোধ তাঁর সেনাদল বিসর্জন দিতে পেরেছিল। মৃতের প্রতি এই রকম অসম্মান কেউ যে করতে পারে তা গোটা বিশ্বের আজ জানা উচিত। আজ আমরা জানি, নেতাজির প্রতি ব্রিটিশের এক চরম আক্রোশ এবং ভয়ই এই ঘটনার প্রতিফলন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমেরিক সিং কৃষ্ণা বসুকে বলেছিলেন, যখন সৌধটি উড়িয়ে দেওয়া হল তখন উপস্থিত আজাদ হিন্দ সেনাদের কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। কেউ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছিলেন, অলরাইট মাউন্টব্যাটেন, আজ তুমি আমাদের মেমোরিয়াল উড়িয়ে দিলে, একদিন তুমিও এইরকম ভাবে উড়ে যাবে! ১৯৭৯-তে আইরিশ বিপ্লবীদের বোমায় যেদিন মাউন্টব্যাটেন সত্যিই উড়ে গেলেন, সেদিন জীবিত অনেক আজাদ হিন্দ সেনার বুকের বোঝা একটু হলেও কমেছিল তা আশা করা যেতেই পারে।

আইএনএ মেমোরিয়াল থেকে বেরিয়ে এবার হাঁটতে থাকি পাদাং পার হয়ে। একটু পরেই পৌঁছে যাই আবার ব্রাস বাসা রোড। আজ এখানে আবার আসার উদ্দেশ্য হল রানি ঝাঁসি ব্রিগেডের ব্যারাক যেখানে ছিল সেই জায়গাকে আরেকবার দেখা। ঐতিহাসিক নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত বলেছিলেন, আজকের সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটি যেখানে, সেখানেই ছিল রানি ঝাঁসি ব্রিগেডের ব্যারাক এবং আজ যেটা সিঙ্গাপুর আর্ট মিউজিয়াম, তার সামনের ছোট মাঠে ওঁরা প্রাত্যহিক ফল-ইন করতেন। কিন্তু নেতাজির বাড়ি মেয়ার রোডের যেখানে ছিল সেখানে নাকি আজ এক পেল্লায় কন্ডোমিনিয়াম হয়ে গেছে। সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির বিশাল বাড়ির দিকে তাকিয়ে ঝাঁসি বাহিনীর ব্যারাক কল্পনা করে নেওয়া বেশ কঠিন ছিল। এর ওপর মেয়ার রোডের কন্ডোমিনিয়াম দেখা এবং তা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বুঝতে পারি। র‍্যাফেলস হোটেলের বারান্দা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে দেখি লেখা আছে ককটেল পানীয় সিঙ্গাপুর স্লিং-এর ইতিহাস। হাসি পায় মানুষের ইতিহাস-বিলাসিতার বিষয় নির্বাচনে।

৬

স্বামী সমচিত্তানন্দজি বলেছিলেন সিঙ্গাপুরে বরাদ্দ শেষ দু'দিন আমি আশ্রমের গেস্ট হাউসে থাকতে পারি। তাই সকাল হতেই হস্টেল থেকে চেক-আউট করে প্রথমেই ছুটি চ্যান্সেরি লেন দেখব বলে। ব্যাগ পড়ে থাকে হস্টেলের লবিতে। এই চ্যান্সেরি লেনেই ছিল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের দফতর। নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তর গবেষণালব্ধ বই— *আ জেন্টলম্যানস ওয়ার্ড* থেকে আগেই জানতাম যে লিগের সেই ঐতিহাসিক বাড়িটি আর নেই, যেমন নেই নেতাজির মেয়ার রোডের বাড়ি। নেতাজির যে বাড়ি ভারতের শেষ স্বাধীনতা

সংগ্রামের ভূমিকা এবং যবনিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল— তার এক বহুতল কন্ডোমিনিয়ামে পরিণত হওয়া চোখে দেখতে পারব না বলেই যাবার চেষ্টা করিনি। তবে যখন শুনেছিলাম চ্যান্সেরি লেন রাস্তাটা অনেকটা একই রকম আছে, তখন একবার দেখে আসাই ঠিক মনে হয়েছিল। ম্যাপ বলছিল জায়গাটা নোভেনা অঞ্চলে। নোভেনা স্টেশনের বাইরে একটা সেভেন-ইলেভেন দোকানের চিনা কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করতেই পথনির্দেশ পেলাম। সঙ্গে পেলাম অতিরিক্ত প্রশ্ন। চ্যান্সেরি লেনে কী করবে? ওখানে তো দেখার কিছুই নেই। পশ এলাকা! সব বাংলো-বাড়ি ওখানে। বাংলো শুনে আমি উৎসাহিত হই। হেসে জবাব দিই— ঐতিহাসিক একটা বাংলোই আমি খুঁজছি। সে সময়কার সত্যিকারের অভিজাতেরা সেখানে থাকতেন। ধন-সম্পদ দিয়ে সেই আভিজাত্যের বিচার করা যাবে না। শুনে কিছুই বুঝলেন না চিনা ভদ্রমহিলা। ভাবলেন সাতসকালেই এক ছিটগ্রস্তের পাল্লায় পড়া গেছে!

থমসন রোড ধরে একটু হাঁটতেই পথে পড়ল নোভেনা চার্চ। ১৯৩৫-এ এখানেই ছিল চার্চ অফ সেন্ট অ্যালফনসাস-এর ছোট গির্জা। এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার এক গথিক স্টাইলের ঝকঝকে নতুন গির্জাঘর। ইতিহাস মুছে ফেলা হয়নি, বরং তাকে নতুনভাবে, আরও মজবুত করে গড়া হয়েছে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ সিঙ্গাপুর ডলার খরচ করে। বিশ্ব জুড়েই এরকমটা দেখা যায়। মন্দির-মসজিদ-গির্জা এবং রাজপ্রাসাদ গড়তে— টিকিয়ে রাখতে— যত টাকা খরচ করা হয় তার কিয়দংশও ব্যবহার করা হয় না স্কুল কিংবা হাসপাতাল তৈরিতে। ধর্মভীরুতা মানুষের মজ্জাগত। পান থেকে চুন খসলেই ঠাকুর পাপ দেবেন— এই মন্ত্র চিরকালই তাই শাসকের রাজনীতির ব্রহ্মাস্ত্র। চার্চ পার হয়ে বাঁক নিতেই মিনিট দশেক হাঁটা পথে পেয়ে গেলাম চ্যান্সেরি লেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন এক টাইম ট্রাভেল ঘটে গেল!

চ্যান্সেরি লেন রাস্তাটা একটা টিলার গা বেয়ে উঠেছে। মনে হল ঠিক যেন কোনও হিল স্টেশনে এসে পড়েছি। রাস্তার দু'পাশে একের পর এক গাছপালায় ঘেরা বাংলো, তাদের সামনে ছড়ানো লন। বেশিরভাগ বাংলোরই গাড়িবারান্দা রয়েছে। এখনও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এখানে অবিকল রয়েছে। আমার হাতে ছিল নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত-র সেই বই। এই বইতেই একমাত্র একটা স্পষ্ট ছবি রয়েছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের অফিসবাড়িটির। রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য। দু'-একটা বাংলোর গেটে সিকিউরিটি গার্ডকে ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি, এরকম বাড়ি এপাড়ায় কেউ দেখেছে কি না? সকলেই ঘাড় নাড়ে। কৃষ্ণা বসুর লেখায় পড়েছি বাড়িটি ছিল একেবারে টিলার মাথায়। সেইরকম আন্দাজমতো একটা জায়গায় গিয়ে এক মজবুত দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাংলোটার একটুখানি উঁকি মারছিল। দেখলাম একটা কলিং বেল আছে। যা থাকে কপালে এই ভেবে কলিং বেল টিপে দিলাম। বেশ কয়েকবার কলিং বেল বাজাবার পর এক চিনা ভদ্রমহিলার আবির্ভাব হল। দূর থেকে আমাকে দেখেই তিনি স্থির। দরজার কাছেও এলেন না। নির্ঘাত চোর-ডাকাত ঠাউরেছেন আমাকে। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ল? এই বাক্যের শেষ শব্দ— ল-টি হল সিঙ্গাপুরের প্রচলিত ভাষার পরিচায়ক, আদর করে যাকে বলা হয় সিংলিশ। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বেশ খানিকটা চিনা এবং মালয় মিশে সিংলিশের জন্ম। আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত হিংলিশ বা বাংলিশ যাঁরা শুনেছেন তাঁরা সিংলিশের সমব্যথী হবেন সন্দেহ নেই। যাই হোক, ভদ্রমহিলার প্রশ্নের একটা জবাব দেবার প্রয়োজন ছিল। তাই বলি, আই ওয়ান্ট টু সি দি হাউস ল। জাস্ট ওয়ান ফোটো ল। প্লিজ় ল। আই কাম ফ্রম ফার ল। আমার কোনও অনুরোধেই ভদ্রমহিলার মন গলে না। সরি ল, নো ল, বলে উনি আবার বাড়ির

ভিতর ঢুকে যান। আমি ভাবি, এত ল-ল করেও শেষে না শুনতে হল! তা হলে এভাবেই কি ললনা শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল? ঝাঁঝাঁ রোদে ঘুরে বেরিয়েও আমার রসবোধ একেবারে শুকিয়ে যায়নি দেখে আশ্বস্ত হলাম।

চ্যান্সেরি লেনের ঐতিহাসিক সেই বাড়িটি খুঁজে পেলাম না শেষ পর্যন্ত। ফিরে এলাম বার্টলে রোডের আশ্রমে। দেখি গিরি নামের এক যুবক অপেক্ষা করছে আমার। প্রেসিডেন্ট মহারাজ ওকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমাকে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবার। গিরির সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম বেশ লাজুক ছেলে। দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছে আট বছর হল। আশ্রমেই কাজ করে। বিকেলে আমার স্কুলের বন্ধু সৌম্য এল। ওর গাড়িতেই এবার গন্তব্য নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের বাড়ি। সন্ধের নেমন্তন্ন ওখানেই। শ্রীমতী সেনগুপ্তের মতো মানুষের শ্রমসাধ্য গবেষণাই আজ মালয় উপমহাদেশে নেতাজির উত্তরাধিকারকে স্পষ্ট করে তুলেছে। নীলাঞ্জনাদি অপেক্ষা করে ছিলেন। যাঁর লেখা বই শেষ কয়েকমাস ধরে পড়ছি তাঁকে সামনে পেয়ে কী প্রশ্ন করব ভেবে উঠতে পারি না। যুদ্ধকালীন বর্মায় নেতাজির বেশ কিছু মানবিক ঘটনা ঘুরেফিরে আসে আমাদের ঘরোয়া কথোপকথনে। এক একনিষ্ঠ নেতাজি-গবেষকের সান্নিধ্যে ঋদ্ধ হয়ে যখন আশ্রমে ফিরলাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

৭

আগে থেকেই খবর ছিল নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত সিঙ্গাপুরে তাঁর জন্মদিন কেউ পালন করেন না আজকাল। সিঙ্গাপুরে অগণিত ভারতীয় শুধু নয়, বহু বাঙালির বাস। তা সত্ত্বেও নেতাজির জন্মদিন পালনের সময় কারও নেই! আসলে সিঙ্গাপুর-প্রবাসী বাঙালি মাত্রেই অল্পবয়সি দম্পতি, বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত। নিজেদের মধ্যে নানা সামাজিক কাজকর্মে মেলামেশার বেশ সক্রিয় সংগঠন আছে এঁদের। দুর্গাপুজো ছাড়াও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লেগেই থাকে বছর জুড়ে। মাঝেমধ্যে টুকরো চ্যারিটির ছোটগল্প শোনা গেলেও, এঁদের সব অনুষ্ঠানই মূলত মনোরঞ্জনমূলক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সিঙ্গাপুরের গৌরবজনক ইতিহাস এবং নেতাজির স্মৃতি নিয়ে তাঁদের কারও মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। আধুনিক উচ্চশিক্ষিত বাঙালি অনেকদিনই আত্মমগ্ন। তাঁদের ছেলেমেয়ে যাতে কেবল দুধে-ভাতে না থেকে বিদেশের ভিলার বারান্দায় বসে ফরাসি রেড ওয়াইনে চুমুক দিতে পারে, সেই সাধনায় তাঁরা নিমগ্ন। ২৩ জানুয়ারি সকালে আমি তাই একবার যাই ইন্ডিয়া হেরিটেজ সেন্টারে। দেখি বহুতল সেন্টারের একটা ফ্লোরের এককোণে জায়গা পেয়েছেন নেতাজি এবং তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামের দিন। রয়েছে নেতাজি, গাঁধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। তাঁর পাশে একটি কাচের শো-কেসে সাজানো আছে আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু টুকরো স্মৃতি। রয়েছে ক্যাপ্টেন জন জেকবের ইউনিফর্ম। জন জেকব ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য। রয়েছে কলকাতা থেকে ২১ এপ্রিল ১৯৪৬-এ প্রকাশিত *দি ওরিয়েন্ট উইকলি*-র প্রচ্ছদ; যেখানে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর এক অপূর্ব পাতাজোড়া ছবি। জ্বলজ্বল করছে আজাদ হিন্দ সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। রয়েছে টোকিও ক্যাডেটদের একটি জাপানি বিমান ঘিরে তোলা এক অসাধারণ সুন্দর গ্রুপ ছবি। দেখে আশ মেটে না এমন সব স্মৃতি। মনে হয় আমি কেন তখন জন্মাইনি!

বিকেলে দেখা হয় সিঙ্গাপুরের দুই পর্বতারোহী বন্ধু ভিনি ট্যান এবং জয়েসের সঙ্গে। ভাবলে মজা লাগে যে শেষবার আমাদের দেখা হয়েছিল কিরগিজস্তানে, লেনিন শৃঙ্গের বেস ক্যাম্পে। সিঙ্গাপুরের ঐতিহ্য বজায় রেখেই ভিনি আমাকে দেখা করতে বলেছিল একটা শপিং মলে। ভাগ্যিস বলেছিল, তাই আমি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম খাঁটি সিঙ্গাপুরিয়ানদের শপিং-ম্যানিয়া কাকে বলে! শপিং মলে ঢোকা মাত্র শরীরের ভাষা পরিবর্তন হয়ে গেল ভিনির। আই হ্যাভ টু গেট আ ফিউ থিংস— বলেই একের পর এক দোকানে সে ঢুঁ মারতে শুরু করল। এত দ্রুত সেই ঢুঁ মারার গতি এবং এমন টারগেট ওরিয়েন্টেড সেই আক্রমণ যে তা সার্জিকাল স্ট্রাইকের রোমহর্ষক গল্পকেও হার মানাবে। অন্য কেউ তার লক্ষ্যে হাত দেবার আগেই ভিনি সেটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টায় যেভাবে লড়ে গেল, তাতে হাঁ হয়ে গেলাম। অবশ্য এই ঘটনায় আমার এক বোধোদয় হল বলা যেতে পারে। আমি বুঝতে পারলাম, শপিংই হল যথার্থ সিঙ্গাপুরি কলা। কেনাকাটার পর ভিনি জানায় তিনটে রুকস্যাক ওর আছে, তবু এই নতুন ডিজ়াইনের রুকস্যাকটা দেখে 'না নিয়ে পারা গেল না'। আমি জানি, এই 'না নিয়ে পারা না যাওয়া'র মন্ত্রটাই ভোগবাদের ভিত্তি। এই মন্ত্রপাঠ জনগণ বন্ধ করলেই ধনতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। তবে ভয় পাবেন না! টুইন টাওয়ার ভাঙলেও ধনতন্ত্র কোথাও ছুটি কাটাতে যাচ্ছে না; কারণ কম-বেশি আজ আমরা সকলেই এই সংক্রমণের শিকার। আবার এও শুনতে পাওয়া যায়, আজকের বিশ্বে সব ক্যাপিটালিজ়মই 'ক্রোনি' নয়, ভাল করে খুঁজলে নাকি 'গুড' অর্থাৎ 'সদিচ্ছুক' ক্যাপিটালিজ়মেরও দর্শন পাওয়া যায়। যাই হোক, ডিনারে চাইনিজ় চিকেন রাইস খাওয়াতে নিয়ে যায় আমার বন্ধুরা। কিরগিজস্তানের স্মৃতিচারণ চাপা পড়ে যায় আমার বর্তমান অভিযানের গল্পে। ক্যাথে সিনেমার ঘটনা শুনে চোখ কপালে তোলে জয়েস। বলে, এবার থেকে ক্যাথে-র দিকে তাকালে আমার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা মনে পড়ে যাবে।

মালয়েশিয়া পর্ব

১

পরদিন সকালে চলে আসি হারবার ফ্রন্ট। চেপে বসি কুয়ালালামপুরগামী বাসে। বাস ছেড়ে দেয় যথাসময়ে। জোহোর প্রণালী পার হয়েই মালয়েশিয়ার সীমান্ত। ইমিগ্রেশনে সময় লাগে না একেবারেই। জোহোর বাহ্রু শহরকে পাশ কাটিয়ে আমার বাস এগিয়ে চলে উত্তরে রাজধানীর দিকে। আমি জানলা দিয়ে দেখি দিগন্তবিস্তৃত সবুজ। একসময় ছিল রেন ফরেস্ট। আজ সভ্যতার চাহিদায় সব কাটা পড়ছে। প্রাচীন অরণ্যের জায়গায় দেখা দিচ্ছে বনস্পতির চাষ। গত পনেরো বছরে ৪৮০০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রেন ফরেস্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কর্পোরেট গ্রিড হারিয়ে দিয়েছে হিউম্যান নিড-কে। সারা বিশ্বজুড়েই চলছে মানুষের নিজের পায়ে কুড়ুল মারার এই অদ্ভুত খেলা। ছ'ঘণ্টা পর পৌঁছে যাই কুয়ালালামপুর— যার আধুনিক আদুরি ডাকনাম কেএল। আমাকে অবাক করে দিয়ে স্টেশন নয়— বিখ্যাত পেট্রোনাস টাওয়ার্সের তলায় বাস আমাদের নামিয়ে দিল। সিঙ্গাপুরে একদম সময় পাইনি তাই বাস থেকে নামার পর প্রথমেই একটা এটিএম থেকে কিছু মালয়েশিয়ান রিংগিট তুলে নিলাম। আমার হস্টেল ছিল বুকিট বিনটাং পাড়ায়। একজন ট্র্যাফিক পুলিশকে কীভাবে যাব জিজ্ঞেস করতেই বললেন, এখান থেকেই গ্রিন লাইন বাস ধরুন। ফ্রি বাস। পয়সা লাগবে না। ভবঘুরের পয়সার সাশ্রয় হলে ভাল লাগাটাই স্বাভাবিক। আমার তাই প্রথম পরিচয়েই কেএল ভাল লেগে গেল। কেএল-এর ট্র্যাফিক জ্যাম সুপরিচিত। দু'কিলোমিটার পথ লাগে এক ঘণ্টা। তবে বেলুড় মঠ-ধর্মতলা মিনিবাসের পুরনো এই প্যাসেঞ্জারের তাতে বয়েই গেল। আমার বরং মনে পড়ে নেতাজি প্রথম কুয়ালালামপুর এসেছিলেন ট্রেনে। তখনও আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপন হয়নি। নেতাজিকে অভ্যর্থনা জানাতে এত ভিড় হয়েছিল যে নেতাজি ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামতেই পারছিলেন না। একটু বিরক্ত হয়েই নেতাজি সেদিন বলেছিলেন, হিরো ওয়ারশিপ কোনও কাজের কথা নয়। আসল হল আন্দোলন।

পেট্রোনাস টাওয়ার্সের তলা থেকে গ্রিন লাইনের ফ্রি বাস আমাকে নামিয়ে দেয় বুকিট বিনটাং পাড়ায়। বাসস্টপের পাশেই দেখি এক ফালাফেলের দোকান। সাইন বোর্ড বলে দেয় দোকানের মালিক দামাস্কাসের মানুষ। সারাদিন বাসে কাটানোর পর দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ফালাফেলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম-এর মহড়া দিতে মন্দ লাগছিল না। ভাবছিলাম ৬ রিংগিট দিয়ে একটা কিনব? নাকি এখন কেবল দেখব? পরে সুবিধা বুঝে একদিন নাহয় খাওয়া যাবে। আমার দ্বিধা দেখেই সম্ভবত দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, দৃশ্যতই মালিক গোছের এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন— এক্সকিউজ মি স্যার, আপনি কি খাবেন, না কোথাও যাবেন? বললাম, খাব এবং যাব; কিন্তু কোথায় যেতে হবে, কদ্দূর হাঁটতে হবে এসব না জেনে ভরসা করে খেতে পারছি না। আমার হস্টেলের ঠিকানা দেখে সিরিয়ান ভদ্রলোক বেশ সিরিয়াস হয়ে নিজের ফোনে গুগল ম্যাপ ঘাঁটা আরম্ভ করলেন। মিনিট কয়েক গবেষণার পর বললেন, প্রথমে

ডানদিকে ১০০ মিটার, তারপর আবার রাইট টার্ন, এবার ২০০ এবং তারপর ব্রিজ পার হয়ে ৫০০ মিটার— ব্যস তা হলেই জালান পুডু। আপনার হস্টেল বুকিট বিনটাং-এ নয়, পুডুতে। বুকিং-এ ঠিকানা ভুল দেওয়া আছে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর দেওয়া ১০০-২০০-৫০০-র সিরিয়ান সিরিজের সিরিয়াস অঙ্ক মিলিয়ে পৌঁছে গেলাম হস্টেল। ভাবলাম, কাল সকাল থেকেই কাজে নেমে পড়তে হবে।

সিঙ্গাপুরে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ সম্পর্কে যত তথ্য, নাম, তারিখ, ঠিকানা বইপত্রে পাওয়া যায়, কুয়ালালামপুর সে তুলনায় ধোঁয়াশায় ঢাকা। অথচ নেতাজি বারবার এখানে এসেছেন। কখনও বক্তৃতা দিতে, যুদ্ধের অর্থ জোগাড় করতে, কখনও একেবারেই সামরিক সংগঠনের কাজে। কুয়ালালামপুর বলতেই আমাদের মনে সবার আগে আসে জানকী থেভার এবং রাসাম্মা ভোপালনের নাম। কিন্তু দেখা যায় নেতাজি তাঁর সেনাপতিত্ব গ্রহণের আগে কেবল কুয়ালালামপুর শহরেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সদস্যসংখ্যা ছিল তিরিশ হাজার। কৃষ্ণা বসুর লেখায় বুঝেছিলাম, সিঙ্গাপুরে নেতাজির ইতিহাস ছড়িয়ে আছে, কিন্তু মালয়েশিয়ায় বেঁচে আছে নেতাজির স্পিরিট। হাতে মাত্র কয়েকটা দিন সময় আর এ শহরে যোগাযোগ বলতে নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের জোগাড় করে দেওয়া এখানকার ডেপুটি হাই কমিশনারের একটা নম্বর। এই সম্বল করে মালয়েশিয়ায় নেতাজি স্পিরিটের ছোঁয়া আমি কি আর পাব? ঠিক করি, পরদিন সকালে প্রথম কাজ হবে এখানকার ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারে যাওয়া। খবরে পড়েছিলাম, তিন বছর আগে এখানেই নেতাজির একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল আজাদ হিন্দের প্রাক্তন কয়েকজন সেনার উপস্থিতিতে। ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারের নামকরণও হয়েছিল নেতাজির নামে। ভাবি, নিশ্চয়ই ওঁরা আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারবেন। আরও শুনেছিলাম, একসময় কয়েকজন আজাদ হিন্দ প্রাক্তনী মিলে তৈরি করেছিলেন এক সংগঠন, যার নাম— নেতাজি সেন্টার। তার হদিশও নিশ্চয়ই এই কালচারাল সেন্টার থেকেই পেয়ে যাব। ঘুম আসছিল না। হরবক সিং-এর লেখা পড়ছিলাম। লেখা ছিল, ১০ জানুয়ারি ১৯৪২— জাপানি সেনা এসে গেছে কুয়ালালামপুরে, তন্নতন্ন করে লুকোনো অস্ত্র এবং ব্রিটিশ গুপ্তচর খুঁজছে তারা এই পুডুপাড়াতেই। পড়তে থাকি। ঘুম চলে যায়।

২

সকাল হতেই প্রথম কাজ ছিল একটা স্থানীয় সিম কার্ড জোগাড় করা। ঠিকানা বিভ্রাট এবং সিরিয়ান সিরিজের অঙ্ক করার শখ আর ছিল না। হস্টেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশেই এক মোবাইল ফোনের দোকানে ঢুকে দেখি পরিষ্কার বাংলায় কথাবার্তা চলছে— পূর্ববঙ্গের ছাপ সুস্পষ্ট। ফলে সিম এবং সঙ্গে ইন্টারনেট প্ল্যান পেতে অসুবিধে হয় না। আমার নিজের ফোনের আলাদিনের দৈত্য জেগে ওঠে। আর আমায় পায় কে? এবার চষে ফেলব কেএল। প্রযুক্তি সত্যিই এক আমূল পরিবর্তন এনেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কেএলের দুর্ভেদ্য কংক্রিট জঙ্গল— সর্বত্রই তার সমান বিচরণ। শর্তাবলি প্রযোজ্য হলেও, সাধারণ মানুষের জীবনে এও এক ধরনের ক্ষমতায়ন। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুডু থেকে অল্প হেঁটে চলে আসি বুকিট বিনটাং মোনোরেল স্টেশন। ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার মেনারা সেন্ট্রাল ভিস্তা নামের একটা অফিস বাড়িতে। গুগল দৈত্য বলছিল কেএল সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমে একটু হাঁটতে হবে। কুয়ালালামপুরের

লোকাল ট্রেন-ব্যবস্থা অসাধারণ। মোনোরেল, এলআরটি, এমআরটি, কমিউটার, ইন্টারসিটি এবং এক্সপ্রেস লাইন— এক ডারউইনস বার্ক মাকড়সার থেকেও জটিল জাল বুনে রেখেছে শহরজুড়ে। এক একটা স্টেশন বহুস্তরীয়। এইসব মাল্টিলেভেল স্টেশনে বিভিন্ন লাইন মিলেছে। আবার ছড়িয়ে গেছে। বাস স্টেশনও-বা কম যায় কীসে! পাবলিক বাসের মানের কথা ছেড়ে দিলাম, বাস টার্মিনালগুলোও বিমানবন্দরকে হার মানাতে পারে। স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরেও বিশ্বমানের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য, সুব্যবস্থা, পরিকাঠামোর ধারেকাছে আমরা আসতে পারিনি। আর রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতার কথা নাই-বা তুললাম। এখনও যে দেশের স্কুল-কলেজে পড়া মানুষকে বলতে হয়— যেখানে-সেখানে থুথু ফেলবেন না, প্রস্রাব করবেন না, আবর্জনা ফেলবেন না— তাদের যে ন্যূনতম শিষ্টাচার এবং নাগরিক বোধ নেই তা বলাই বাহুল্য! যেটা আছে সেটা হল এক অন্ধ অহংকার। টি এস এলিয়টের ‘হলো মেন’-এর মতো ভারতবাসীর আত্মা আজ মৃত। সে আজ তাই জাবর কাটার মতো বলে চলে, আমরাই জাতিশ্রেষ্ঠ। বলে, সেই *বেদ-উপনিষদ-এর* যুগ থেকে চাঁদ-মঙ্গলে নিত্য আমাদের যাতায়াত এবং আমাদের মতো বিশ্বের উচ্চতম স্ট্যাচুও ওদের নেই! আমার কাছে এগুলো এক গভীর অবসাদগ্রস্ত মানুষের প্রলাপের মতো শোনায়।

কেএল সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে হেঁটে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে যাই বহুতল বাড়ি মেনারা সেন্ট্রাল ভিস্তা। লিফট নিয়ে যায় আঠারো তলায়। লিফট থেকে বেরতেই দেখি বড় বড় করে লেখা— নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার। দেখে সত্যিই মন ভরে ওঠে। অফিসে পা রাখতেই চোখে পড়ে ব্রোঞ্জে তৈরি নেতাজির আবক্ষ মূর্তি যা উদ্বোধন করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তনীরা, ২০১৬-তে। এই কেন্দ্র আসলে দিল্লির আইসিসিআর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস)-এর একটি অঙ্গ। মালয়েশিয়ার ভারতীয়দের দীর্ঘদিনের আবেদনের ফলে অবশেষে আজ তা নেতাজির নামাঙ্কিত। রিসেপশনের ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করি এখানে নেতাজি সম্পর্কিত কিছু তথ্য বা ছবি রয়েছে কি? ভদ্রমহিলা ঘাড় নাড়েন। বলেন, আমি কিছুই জানি না। সব জানে হরি। আমি ভাবি— বাপরে, সকাল সকাল আধ্যাত্মিক আলোচনা! অবশ্য এটাই তো ইন্ডিয়ান কালচার। যা করার সব তিনিই করছেন, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমার ভুল ভেঙে দিয়ে ভদ্রমহিলা বলেন, না না ভগবান হরি নয়, আমি আমাদের অফিসার মি. হরির কথা বলছিলাম। বলতে না বলতেই মি. হরির দেখা পেলাম। একগাল হেসে বললেন, এখানে নেতাজির নাম আর এই মূর্তিটাই কেবল আছে। নেতাজি সেন্টার সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞেস করায় হরিবাবু বললেন, হ্যাঁ ওরকম একটা কিছু আছে বলে শুনেছি। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। ঠিকানাটা দিতে পারেন? আবার প্রশ্ন আমার। মি. হরি এবার অপ্রস্তুত। বলেন, আমাদের কাছে ওঁদের কোনও খবরই নেই। বুঝতে পারি ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মা এখানে আসন-প্রাণায়াম এবং নানাবিধ প্রাণের আরামে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। নামকরণ মালয়বাসী ভারতীয়দের তুষ্ট করার একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র। কুয়ালালামপুর তথা মালয়েশিয়ার বুকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ণায়ক অধ্যায় ঘটেছিল তার সম্বন্ধে নিদেনপক্ষে একটা ফোটো গ্যালারিও যে এখানে রাখা যেত তা এই সংস্কৃতি- ধারক এবং বাহকদের মনে হয়নি। সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে আসি। এবার গন্তব্য বিবেকানন্দ সেন্টার। অল্প হাঁটতেই দেখতে পাই ছবিতে দেখা সেই বাড়ি এবং মন্দির। ১৯০৪-এ শ্রীলঙ্কার তামিলদের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল একটি স্কুল এবং মন্দির। আজ সেই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনাথাশ্রম, লাইব্রেরি, সভাঘর এবং আরও অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্ম। মাঝখানে

কথা হয়েছিল আশ্রম সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ২০১৬-তে মালয়েশিয়া সরকার বিবেকানন্দ আশ্রমকে দেশের হেরিটেজ-এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই ১১৫ বছরের প্রাচীন এই আশ্রমবাড়ি আর ভাঙা পড়বে না। অক্ষুণ্ণ থাকবে নেতাজির স্মৃতিধন্য অন্তত একটি বাড়ি!

আশ্রম ক্যাম্পাসে বিবেকানন্দের মূর্তির ছবি তুলে বেরিয়ে আসছিলাম এমন সময় এক তামিল ভদ্রলোক বললেন, সন্ধেবেলায় আসুন। আজ গান-বাজনা হবে। আর আগামীকাল আমরা বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করব। পারলে চলে আসবেন। আমার মনে হল, এটাই যথার্থ ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার ভারতীয় আমলাতন্ত্রের একটি বৈদেশিক গামলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মি. হরি বলেছিলেন দশ মিনিটের মধ্যেই আমাকে নেতাজি সেন্টারের খবর নিয়ে ফোন করবেন। একঘন্টা পরেও যখন হরির বোল শুনতে পেলাম না তখন নিজের ফোনের গুগল-দৈত্যকেই আবার জাগিয়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হল।

৩

নেতাজি সেন্টার লিখে টাইপ করতে প্রথমেই আসছিল সেই ইন্ডিয়ান গামলা, থুড়ি, কালচারাল সেন্টার। তার তলায় আসছিল নেতাজি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বলে কোনও এক সংগঠনের নাম। লেখা ছিল এটি একটি নন-প্রফিট সংস্থা। ফোন নম্বর এবং একটা ঠিকানাও ছিল। ফোন করে ফেললাম। বেশ কয়েকবার ফোন বেজে কেটে গেল। আরেকবার করলাম। এবারও কেউ ধরল না। মনে হল নির্ঘাত পুরনো নম্বর। ঠিকানাটায় সটান গিয়ে উপস্থিত হব? যদি কেউ না থাকে সেখানে? এইসব প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে লাগল। নেতাজি সেন্টারের কথা কৃষ্ণা বসুও লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, সেই সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত, নেতাজির প্রেরণায়, তাঁর জীবনদর্শনে উজ্জীবিত শ্রীগুরুপথমের কথা। ১৯৮২-তে শ্রীমতী বসু যখন কুয়ালালামপুরে এসেছিলেন, তখন মালয় ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের এক জনসভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই জনসভায় মালয় ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি সামিভেল্লু ঘোষণা করেছিলেন নেতাজির নামে একটি অডিটোরিয়াম তৈরির কথা। বলেছিলেন, নেতাজি ফান্ড নামে এক তহবিলের সঞ্চিত অর্থ দিয়েই মালয় ইন্ডিয়ান কংগ্রেস বাড়ির জমিটি কেনা হয়েছিল। সামিভেল্লুর সেই ঘোষণায় সমবেত জনতা আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোষণার তিন দশক পার হয়ে গেলেও অডিটোরিয়াম আর তৈরি হয়নি। ইতিমধ্যে নেতাজির অনুগামীরা সকলেই সময়ের নিয়মে হয়েছেন অশীতিপর এবং জরাগ্রস্ত। বেশিরভাগই আজ আর বেঁচে নেই। ভারত সরকারকে বারবার চিঠি লিখেও কোনও জবাব তাঁরা পাননি। আধুনিক প্রজন্মের ইতিহাসবিমুখতা ব্যাপারটাকে ভুলে যেতে সাহায্য করেছে। তাই, আজ এতকাল পরে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারের আগে নেতাজির নাম বসিয়ে দেওয়াটা 'জাস্টিস ডিলেড ইজ় জাস্টিস ডিনায়েড'-এরই সমান বলেই আমার মনে হয়। এমন সময় আমার ফোন বেজে ওঠে। ওপার থেকে ভেসে আসে এক ভারী তামিল অ্যাক্সেন্টের ইংরেজি। হ্যালো, ইউ কলড। মে আই নো হাউ ক্যান আই হেলপ ইউ? মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে, ছোটবেলার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তর দেবার মতো করে আমি গড়গড় করে নিজের কুয়ালালামপুর আসার উদ্দেশ্য জানাই। উত্তর আসে, আগামীকাল আমাদের অফিসে চলে আসুন। আর দুপুরের খাওয়াও আমাদের সঙ্গেই করবেন, কেমন? ফোন

কেটে যায়। নিজেকে ব্যাপারটা বোঝাতে কয়েক মিনিট লাগে। নেতাজি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের এই ভদ্রলোক আমাকে আগামীকাল ওঁদের অফিসে ডাকলেন শুধু নয়, লাঞ্চও খেতে বললেন! উত্তেজনা এবং আনন্দে রাস্তার ধারে এক কোপিতিয়ামে ঢুকে পড়ি। বলি, নট ব্যাড। গেটিং দেয়ার।

কোপিতিয়াম ব্যাপারটা আমাদের কফি হাউসেরই মতো। একটা চা বা কফি নিয়ে বসে যতক্ষণ খুশি আড্ডা মারা যায়, বই পড়া যায়। এক কাপ কোপি হিতাম অর্ডার দিয়ে ভাবতে বসি। মালয় ভাষায় কোপি হিতাম হল কালো কফি। এই কফি আমাকে কেবল বাঁচিয়ে রাখে তা নয়, চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ করতেও সাহায্য করে। তবে মালয়েশিয়ার কোপিতিয়ামে বিখ্যাত হল হোয়াইট কফি। এই সাদা কফি মানে কেবলমাত্র দুধ মিশিয়ে খুন করা কফি নয়। এই হোয়াইট হল কফি রোস্টিং-এর একটি পদ্ধতি। এই বিশেষ পদ্ধতির ফলে নাকি ক্যাফিনের মাত্রা এই হোয়াইট কফিতে সাধারণ কালো কফির থেকে বেড়ে যায়। তবে কফির জগতে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের এই ব্যাপারটা পল ম্যাকার্টনি এবং স্টিভি ওয়ান্ডারের গানের মতোই সরল। ভাবি, আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি, সকালে প্রথমেই যেতে হবে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন। আর সেখান থেকে সটান নেতাজি ফাউন্ডেশন। তা হলে এখন কী করা যায়? সিঙ্গাপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের পুরনো আশ্রমের কথা বলতে গিয়ে ব্রহ্মচারী কৈলাসমের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, নেতাজির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ এক সখ্য গড়ে ওঠার কথা। যুদ্ধ শেষ হবার পর ব্রহ্মচারী কৈলাসম ভারতে আসেন এবং তাঁকে লেখা নেতাজির সমস্ত চিঠি ও বেশ কিছু জরুরি কাগজপত্র তুলে দেন শরৎ বসুর হাতে। সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন নেতাজি যে টেবিল এবং চেয়ার ব্যবহার করতেন সেগুলোও ছিল ব্রহ্মচারী কৈলাসমের কাছে। সবই তিনি শেষ পর্যন্ত কলকাতার নেতাজি মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এইসব পড়ার পর থেকে ব্রহ্মচারীজি সম্পর্কে আমার কৌতূহল বেশ বেড়ে গিয়েছিল। সবকিছু ছাড়িয়ে যে মানুষ নেতাজির এত ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে আরও একটু জানা খুব দরকার মনে হচ্ছিল। কৃষ্ণা বসু কেবল এটুকুই লিখেছিলেন যে, উনি কুয়ালালামপুরে ‘পিয়োর লাইফ সোসাইটি’ নামের এক সংগঠন স্থাপন করেছিলেন। সিঙ্গাপুরে স্বামী সমচিত্তানন্দজির সঙ্গেও তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই পর্যন্তই। কোপি হিতাম বলে দিচ্ছিল, এবার সময় হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার। অতএব আবার গুগল।

গুগল বলে দিল পিয়োর লাইফ সোসাইটির ঠিকানা এবং ফোন নম্বর। সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ কল করলাম। এক ভদ্রমহিলা ফোন ধরলেন, সেক্রেটারি গোছের কথাবার্তা। বললেন, চলে আসুন। কমিউটার ট্রেন ধরে আসতে হবে। আমরা শহরের একটু বাইরে। কেএল সেন্ট্রাল থেকে কমিউটার ধরে নামলাম পেতালিং স্টেশন। এবার দু’কিলোমিটার হাঁটা। পথের ধারেই পড়ল ১৯১২-তে স্থাপিত মহামারিআম্মান মন্দির। মনে পড়ল এই মন্দিরেও ঘটেছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের মিটিং। এভাবেই এখনও মালয়েশিয়ায় অনাদৃত, অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দের অগণিত স্মৃতি। দেবস্থান ছাড়া সবই চলে গেছে বিস্মৃতির অতলে। আধঘন্টা পর পৌঁছে গেলাম পিয়োর লাইফ সোসাইটি। বিশাল ক্যাম্পাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অনাথাশ্রম, বিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষার কর্মকাণ্ডের মধ্যে দেখতে পেলাম সেই ব্রহ্মচারী কৈলাসমকে, যিনি পরবর্তী জীবনে পরিচিত হয়েছিলেন স্বামী সত্যানন্দ হিসেবে। মনে হল, এই হল নেতাজির যোগ্য উত্তরাধিকার!

৪

১৫ জুলাই ১৯০৯, মালয়েশিয়ার ইপো শহরে জন্মেছিলেন সত্যানন্দ। বাবা ছিলেন একজন রাবার প্ল্যান্টার। খুব ছোটবেলাতেই সত্যানন্দ তাঁর মা-বাবাকে হারিয়েছিলেন। কাকার তত্ত্বাবধানে ইপোর সেন্ট মাইকেলস ক্যাথলিক স্কুলেই হয়েছিল তাঁর ছোটবেলার পড়াশুনো। ১৯২২-এ স্বামী অভেদানন্দজি যখন মালয় আসেন তখন তাঁর কাছেই প্রথম *ভগবদগীতা*-র শিক্ষা নিয়েছিলেন সত্যানন্দ। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৭-এ চাকরি, সংসার ছেড়ে ইলাহাবাদে মন্ত্রদীক্ষা নেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজির কাছে। এরপর সারা ভারত, শ্রীলঙ্কা, বর্মা ঘুরে বেড়ান পরিব্রাজকের মতো। এই সময়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় গাঁধীজি, ড. রাধাকৃষ্ণন, রমন মহর্ষি এবং ঋষি অরবিন্দের। ১৯৪০-এ সত্যানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী কৈলাসম) দায়িত্ব নেন রামকৃষ্ণ মিশনের সিঙ্গাপুরের বিবেকানন্দ বয়েজ় এবং সারদামণি গার্লস স্কুলের। এরপর সিঙ্গাপুরে নেতাজির আগমন এবং তাঁর অন্তিম সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা তো অল্পবিস্তর ইতিমধ্যেই লিখেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা এবং ব্রিটিশদের মালয় উপমহাদেশ পুনর্দখল করার পর অত্যাচার নেমে আসে স্বামী সত্যানন্দজির ওপর। তাঁকে কখনও আক্রমণ এবং কখনও গৃহবন্দি করে রাখা হয়। নেতাজির সঙ্গে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠনে ব্যাংকক কনফারেন্স থেকে জন থিভি-র সঙ্গে মালয় ইন্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপন; সব জায়গাতেই ছিল স্বামী সত্যানন্দের অগ্রণী ভূমিকা। আজ কুয়ালালামপুরের এক মফসসলে সেই স্বামী সত্যানন্দ স্থাপিত পিয়োর লাইফ সোসাইটিতে এসে মন সত্যিই ভরে যায়। একটা জীবন কীভাবে দেশপ্রেম থেকে মানুষের সেবায় বারবার নিঃস্বার্থভাবে নিয়োগ করা যায় তা নিজের জীবন এবং কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন স্বামী সত্যানন্দ। সত্যানন্দের মতো মানবদরদী, আত্মত্যাগে সদাপ্রস্তুত মানুষকে নেতাজি যে কেন এত গভীর সখ্যে বেঁধেছিলেন তা বুঝতে আর অসুবিধে হয় না। আমার মনে হয় তাঁর প্রতি নেতাজির এক ভ্রাতৃপ্রতিম স্নেহও ছিল। হাজার হোক, নেতাজির থেকে বয়সে বারো বছর ছোট ছিলেন সত্যানন্দ।

২৬ জানুয়ারি সকাল। তামান দুতায় ভারতীয় হাই কমিশনে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ এসেছিল নীলাঞ্জনাদির সূত্রে। আমন্ত্রণ পত্রে সকাল ৮.১৫-র মধ্যে সবাইকে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল দূতাবাসের তরফ থেকে; যাতে ঠিক ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু করা যায়। এদিকে তামান দুতা অঞ্চলে কোনও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যায় না। তাই বাধ্য হয়েই একটা ট্যাক্সি নিতে হয়েছিল। ৮টা বাজার অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। দেখছিলাম সাজো সাজো রব। একটা টিলার ওপর সুন্দর ভিলা গোছের বাড়ি, ল্যান্ডস্কেপড গার্ডেন, গাড়িবারান্দা, উঠোন, পর্চ, ব্যাকইয়ার্ড— সব মিলিয়ে বেশ রাজকীয় ব্যবস্থা। তখনও কেউ আসেনি তাই ভিতরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিলাম। এমন সময় দেখি এক সুবেশ ভদ্রলোক আমায় দেখে ভিতরে ডেকে নিলেন। বললেন, আসুন, আপনি অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য এসেছেন, তাই তো? ভদ্রলোকের ভুল ভাঙিয়ে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলে ফেলি। শুনেই তাঁর মুখে এক পরিবর্তন লক্ষ করি আমি। বুঝি আমার কথা পৌঁছেছে এক সহমর্মীর কানে। আমার নাম শুনেই বলেন, আরে আমিও বাঙালি, আমার নাম অভিজিৎ মিত্র। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে নেমেছেন আপনি, আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন! তারপরেই বলেন, অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আমাদের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কর্নেল চৌহানের সঙ্গে আপনার আলাপ

করিয়ে দেব। আপনার মিয়ানমার সংক্রান্ত প্রশ্ন ওঁকেই করতে পারেন। দূতাবাসে পা রাখার এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি এতটা আন্তরিকতা পাব। নেতাজির স্পিরিটে অভিজিৎবাবু আমাকে একনিমেষে নিজের লোক করে নিলেন! আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম। যথাসময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। পতাকা উত্তোলন এবং উদ্বোধনী সংগীতের পর রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠ করলেন হাইকমিশনার শ্রীমৃদুল কুমার। উপস্থিত সকলকেই রাষ্ট্রপতির ভাষণের একটি করে কপি দেওয়া হয়েছিল। খুঁটিয়ে পড়ে দেখলাম, তাঁর ভাষণে ভারত গঠনের ইতিহাসে গাঁধীজি এবং আম্বেদকর সাহেব থাকলেও নেতাজি কিংবা নেহরু, দু'জনের কেউই উপস্থিত নেই। তিনি হয়তো ভুলে গেছেন ভারতের প্রথম প্ল্যানিং কমিশন ছিল নেতাজির মস্তিষ্কপ্রসূত। ১৯৩৮-এই ভারত স্বাধীন হবার পর কীভাবে দেশের অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে তার পরিকাঠামো পেশ করেছিলেন নেতাজি। এই কাজে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এবং সেই প্ল্যানিং কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জওহরলাল নেহরুকে। কেবল জন-আন্দোলনের নেতৃত্বই নয়, নেতাজির মতো দূরদর্শী কূটনীতিজ্ঞ এবং দেশ গঠনের কারিগর ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত আর আসেননি। যুদ্ধের সময়ও দেখা গেছে আজাদ হিন্দ সেনার পাশাপাশি নেতাজি গড়ে তুলেছেন আজাদ হিন্দ দল— যাঁদের কাজ ছিল সেনার পিছুপিছু এগোনো। যুদ্ধ শেষ হলেই যাতে শহরে এবং গ্রামে অরাজকতা ছড়িয়ে না পড়ে তাই এই প্রচেষ্টা। ইতিহাসের এক সুবিধাবাদী চয়ন যখন দেশের সর্বোচ্চ আসন থেকে আসতে শুরু করে এবং তা রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে অক্ষম হয়, তখন সে-দেশের যে ঘোর দুর্দিন সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

অনুষ্ঠানশেষে কথা হয় শ্রীমৃদুল কুমার, কর্নেল চৌহান এবং ড. বরুণ জেফ-এর সঙ্গে। কর্নেল চৌহান নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা গোপন রাখেন না। ড. জেফ সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। আমি ভাবি এসবই সম্ভব হয় নেতাজির প্রতি সাধারণ মানুষের অন্তরের ভালবাসার জন্য। নেতাজি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি না থেকেও আছেন। সহস্র প্রোপাগান্ডাতেও তাঁর দেশপ্রেম এবং চরম বলিদান ভারতবাসী ভোলেনি। প্রতিনিয়ত তাঁর আত্মা কাজ করে চলেছে কারও না কারও হৃদয়ে। আমার ভাল লাগে এই ভেবে যে, সামান্য এই নাগরিকের হাত ধরে আজাদ হিন্দের পতাকা আজ প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের এক রাষ্ট্রদূত এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের হাতে ধরা দিল।

৫

অনুষ্ঠানের পর দূতাবাসেই জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। সাজানো ছিল শিঙাড়া, বড়া এবং আনারসের হালুয়া। খাবারদাবার দেখে ছোটবেলার সেই পতাকা উত্তোলনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, ১৫ আগস্ট কিংবা ২৬ জানুয়ারি পতাকা তোলার পর খাবারের প্যাকেট পাবার অধীর প্রতীক্ষার কথা। বেরনোর সময় অভিজিৎবাবুকে দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, স্বাভাবিকভাবেই উনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অতিথি আপ্যায়নে। এদিকে আমাকে শহরে ফিরেই ছুটতে হবে নেতাজি সেন্টারের খোঁজে। ভাবি, শেষে আবার একটা ট্যাক্সি নিতে হবে? আমাদের দেশের ওলা-উবেরের মতো সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়ায় চলে গ্র্যাব। ফলে আমার

ফোনেও গ্র্যাব ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম। এখন সেই অ্যাপ খুলতেই দেখি বেলা বাড়ার সঙ্গে দ্বিগুণ হয়ে গেছে ভাড়া।

নিরুপায় হয়ে গ্র্যাব ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখি আরও কয়েকজন ভারতীয় ফোনের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভবঘুরের বিশেষ লাজলজ্জা থাকলে চলে না। তাই গায়ে পড়েই জিজ্ঞেস করি, গ্র্যাব করছেন বুঝি? আমাকে লিফট দেবেন? কেএল সেন্ট্রালের কাছে কোথাও ছেড়ে দিলেই চলবে। সাধারণত অচেনা লোকজনকে, কেবলমাত্র স্বজাতীয় হবার যোগ্যতায় আমরা ভারতীয়রা খুব একটা পাত্তা দিই না, আর বিদেশ-বিভুঁই হলে তো কথাই নেই। এ আমার একেবারেই নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। একজাতি হিসেবে ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের একেবারেই নেই, কোনওদিনই গড়ে ওঠেনি। কারণ, ভ্রাতৃত্ব এবং একতা যাতে কোনওদিনই না আসে তার জন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তার ওপর এঁরা হলেন গিয়ে এক্সপ্যাট। সারা পৃথিবীতেই লক্ষ করেছি, জাতি নির্বিশেষে এঁরা এক পৃথক প্রজাতির মতোই থাকেন। লিনিয়াস সাহেব বেঁচে থাকলে নির্ঘাত নাম দিতেন হোমো সেপিয়েন্স এক্সপ্যাট্রিয়ানা। কিন্তু, আমাকে আজাদ হিন্দের পতাকা নিয়ে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছবি তুলতে এঁরা দেখেছিলেন। তাই সম্ভবত আমাকে একটা কেউকেটা ভেবে লিফট দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

কেএল সেন্ট্রালে নেমে ধরি পরিচিত মোনোরেল। হস্টেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই এবার গন্তব্য নেতাজি সেন্টার। গুগল বলছিল কিলোমিটার দুয়েকের মধ্যেই তাঁদের অফিস, তাই হাঁটতে লাগলাম। কাছাকাছি এসে ফোন করলাম। ফোন ধরলেন মি. নারায়ণ স্বামী নিজেই। বললেন, দাঁড়াও যেখানে আছ, আমি নীচে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসছি। তুমি একা এলে আমাদের অফিস খুঁজে পাবে না। একটা ওষুধের দোকান আছে, দেখতে পাচ্ছ? ওটার সামনে দাঁড়াও। কয়েকমিনিটের মধ্যেই নীচে এসে আমাকে নিয়ে অফিসের দিকে চললেন নারায়ণ স্বামী। বললেন, পঁচাশি বছর বয়স হল, এই নেতাজি সেন্টার আগলে রেখেছি; আর কতদিন পারব জানি না! একটা ছোট একশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি এক লম্বা টেবিল আর তার ওপর ফাইল এবং কাগজপত্রের স্তূপ। দেওয়াল ঘেঁষে ঘরের মেঝেও নানান জিনিসপত্রে বোঝাই। আর ঘরের একপ্রান্তের দেওয়ালে নেতাজির এক বিশাল তৈলচিত্র। মি. নারায়ণ স্বামী সেই মুহূর্তে আমাকে কিছু বলছিলেন। কিন্তু আমি তৈলচিত্র থেকে নজর সরাতে পারছিলাম না। নেতাজি সংক্রান্ত গবেষণায় এই ছবির উল্লেখ একমাত্র পাওয়া যায় কৃষ্ণা বসুর লেখায়। তাই আমি জানতাম এই ছবির গুরুত্ব কতখানি! আমি জানতাম, কোনও ফোটোগ্রাফ দেখে আঁকা হয়নি এই তৈলচিত্রটি। নেতাজি স্বয়ং শিল্পীর সামনে বসেছিলেন। তাই সারা পৃথিবীতে নেতাজির এমন ছবি আর দুটি নেই! শ্রীনারায়ণ স্বামী আমার অবস্থা দেখে মুচকি হাসেন। বলেন, নেতাজি-সম্পর্কিত সব কিছুই আমরা হয় দূতাবাসে, নয় ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কেবল এই পেইন্টিং কাছছাড়া করতে পারিনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি পেইন্টিংটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। নারায়ণ স্বামী বলেন, এই ছবি আঁকার গল্পটাও মজার। শুনবে? বলতে গিয়ে তিনি কিছুটা উদাস হয়ে যান, আমি ওঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি গোগ্রাসে গল্পটা শুনব বলে।

নারায়ণ স্বামী বলতে থাকেন, সেসময়ে নেতাজিকে যুদ্ধের এবং সংগঠনের নানা কাজে প্রায়ই কুয়ালালামপুর আসতে হত। তবে বিশ্রামের সময় তাঁর কখনওই থাকত না। নেতাজির এরকমই এক ভিজিটের দিনে আমাদের পরিচিত এক শিল্পী শ্রীনাম্বিয়ারকে দিয়ে আমরা ওঁর একটা পোর্ট্রেট আঁকাব বলে

আবদার করতে থাকি। নেতাজি প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চান না, বলেন শিল্পীর সামনে অতক্ষণ ধরে বসে থাকার সময় তাঁর নেই। আমরাও নাছোড়বান্দা। এই সময় নাম্বিয়ার বলেন— নেতাজি, আমাকে কেবল আপনার মুখটুকু আঁকার সময় দিন। বাকিটা না হয় আমি আপনার ছবি দেখে সম্পূর্ণ করব। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে কয়েকজন গলিতে দাঁড়ানো একটা সবজিবাহী লরি থেকে এই ক্যানভাস কেটে নিয়ে চলে আসে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তো, তখন আমাদের আটকায় সাধ্য কার! সেই চুরি করা ক্যানভাসেই নাম্বিয়ার সৃষ্টি করেন এই মাস্টারপিস। পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছি স্বয়ং নেতাজির সামনে! গায়ে কাঁটা দেয়। অবিশ্বাস্য মনে হয় এই মুহূর্ত! চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমার অবস্থা দেখে নারায়ণ স্বামী বলেন, জানো আমি বালক সেনা ছিলাম। আমি দু'-দু'বার নেতাজির সঙ্গে হাত মিলিয়েছি? বলেই শুরু করেন বারো বছর বয়সে তাঁর বালক সেনায় ভরতি হবার গল্প। বিস্ময়াবিষ্ট আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর পাশে বসে শুনতে থাকি সেইসব উত্তাল দিনের কথা। দেখি নেতাজির নাম করলেই আজও আমার পিতৃস্থানীয় এই মানুষটির দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এক অদ্ভুত আলোয়। এক অব্যক্ত প্রাপ্তিবোধ আমায় আবিষ্ট করে রাখে। সেই মুহূর্তে মনে হয়, ভাগ্যিস পথে নেমেছিলাম! না হলে জীবনের অনেকটা ফাঁকা রয়ে যেত!

৬

১৯৪৩-এ আঁকা নেতাজির সেই অমূল্য তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল আমি ছবিটির দিকে তাকিয়ে একটা গোটা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। মনে হচ্ছিল, আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিকরা, আজও নেতাজির যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি। যে জাতীয়তাবাদ, ভ্রাতৃত্ব এবং দেশপ্রেমে উনি বিশ্বাস করতেন, গত বাহাত্তর বছরে তার থেকে ক্রমশ বহু দূরে সরে গেছি আমরা। ভারতে বাস করা বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মানুষকে বোঝার চেষ্টা না করে, প্রত্যেকদিন তাদের আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। নেতাজির জাতীয়তা বোধ ছিল ইনক্লুসিভ— সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার এক দর্শন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে তিনি সেটা হাতেকলমে করেও দেখিয়েছিলেন। এত যে শিক্ষার বড়াই আমাদের, তবু কেন কেউ বুঝতে পারছেন না যে জাতি-ধর্মের ভিত্তিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ঘৃণা ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতিরই এক উত্তরাধিকার। ব্রিটিশ চলে গেছে। রয়ে গেছে আমাদের একে অপরের প্রতি ঘৃণা এবং অবিশ্বাস। আর, ভারত এক উদীয়মান অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার— মিডিয়ায় যে সংবাদটি প্রায়ই দেখেন, তার স্বরূপ ২০১৭-র অক্সফ্যামের একটা রিপোর্টেই উদ্ঘাটিত। আজ ভারতের জাতীয় সম্পদের ৭৩ শতাংশ তার ১ শতাংশ মানুষের হাতের মুঠোয়। এসব দেখে মনে হয়, সত্যজিৎবাবু সত্যিই একজন জিনিয়াস ছিলেন। হীরক রাজাদের সম্বন্ধে কবেই তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। মন ভারী হয়ে উঠছিল হতাশায়। মনে হচ্ছিল, নেতাজির চোখের দিকে তাকানোর যোগ্যতা ভারতবাসী হিসেবে আমরা হারিয়েছি। মনে হচ্ছিল, আমার এই অনুভূতি কি কেবলই আবেগপ্রসূত? স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরে এক আটচল্লিশ বছরের ভারতীয় নাগরিকের এ কেমন আবেগ?

ঘোর কাটে নারায়ণ স্বামীর ডাকে। দেখি আরও এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে। বৃদ্ধ বলেন, আমি নারায়ণের বন্ধু, আমার নাম নরসিমহা রাও। চলুন, এবার খেতে যাই। নারায়ণ স্বামী বললেন, তুমি কি

ভেজিটেরিয়ান? আমি হেসে ফেলি। বলি, আপনারা যা খাবেন আমিও তাই। নারায়ণ স্বামী বলেন, না না, তা কী করে হয়? বলো কী খাবে— চিকেন, না মাটন? আমি অবাক হয়ে যাই, এই দু'জন অশীতিপর মানুষের এক অপরিচিত, অখ্যাত আগন্তুকের প্রতি এই অকৃত্রিম স্নেহময় ব্যবহারে! আমার মুগ্ধতার কথা ওঁদের না জানিয়ে পারি না। উত্তর প্রস্তুত ছিল নারায়ণ স্বামীর। বলেন, নেতাজির উত্তরাধিকার খুঁজে বেড়াচ্ছ বললে না? তুমি নেতাজিকে নিয়ে কাজ করছ বলেই তুমি আমাদের নিজের লোক। লিখো আমাদের কথা। বোলো, আজও আমরা নেতাজির জন্য বলিপ্রদত্ত। আমরা তো আর ক'দিন! এরপর তো সবই কোনও মিউজিয়ামের কাচের বাক্সে ডিসপ্লে আইটেম, কিংবা, বড়জোর কোনও গবেষকের বইয়ের পাতায় কয়েকটা অক্ষর হয়ে থেকে যাবে। দুই বৃদ্ধকে ছেড়ে আসতে মন চায় না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নারায়ণ স্বামী বলেন, এইদিকে সোজা চলে যাও দু'কিলোমিটার, তারপর দেখবে সুইস হোটেল। ওখান থেকে বাঁদিকে গেলেই তোমার হস্টেল। যাও, একটা শর্টকাট দেখিয়ে দিলাম। বলে মুচকি হাসেন। ভাল থাকবেন— বলে আমি জোরে পা চালাই। খুব ইচ্ছে করলেও আর পিছন ফিরে তাকাই না। এক অসম্ভব মন খারাপ একটা কালো মেঘের পুঞ্জের মতো আমার পিছনে পড়ে থাকে।

পরদিন বিকেলে দেখা হয় আনন্দরূপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আনন্দরূপ আমার ভ্রাতৃপ্রতিম অগ্নিদীপের দাদা। কেএল পৌঁছনোর আগে থেকেই আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল অগ্নিদীপ। একবছর হল কর্মসূত্রে মালয়েশিয়া প্রবাসী সে। কোনও দরকার হলেই আমাকে জানাবেন অনিন্দ্যদা, বলেছিল আনন্দরূপ। অবশেষে, দুই মুখুজ্যের দেখা হওয়া যখন অবশ্যম্ভাবী মনে হয়, তখন স্বার্থপরের মতো আমার জামাকাপড়ের একটা পুঁটলি ওর হাত দিয়ে দেশে পাঠানোর ছক কষি। বেশ কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু জামাকাপড় অকারণে বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। তাই নিজের পিঠের বোঝা কমানোর এই অভিসন্ধি। বিকেলে দেখা হতেই দু'জনে মিলে হাঁটতে বেরই। নানান গল্পে সময় কেটে যায়। বুঝতে পারি, হোমো সেপিয়েন্স এক্সপ্যাট্রিয়ানা হলেও আনন্দরূপ একটু স্বতন্ত্র।

ইচ্ছে ছিল দেখব সেই ময়দান যেখানে নেতাজি প্রথমবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখন ছিল সেলাংগোর ক্রিকেট ক্লাবের মাঠ। আজ তা মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার স্মারক— মারডেকা স্কোয়ার। আনন্দরূপ জায়গাটা চিনত, তাই আমার ফোন-আলাদিনকে জাগাতে হল না। পড়ন্ত বিকেলে পৌঁছে গেলাম সেই ময়দানে। একঝলকেই চিনতে পারলাম মাঠের প্রান্তে সেই ক্লাব হাউস। একই রকম রয়েছে আজও। ক্লাব হাউসের সেই খোলা বারান্দা এবং ব্যালকনিগুলো অবশ্য আর নেই। ঢাকা পড়েছে এয়ারকন্ডিশনিং-এর ঘেরাটোপে। ভাবি এই সেই ময়দান, যেখানে ১৯৪৩-এর আগস্ট মাসে, আরও কয়েক হাজার ভারতীয়ের মতোই নেতাজির বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন জানকী থেভার (পরবর্তীকালে নাহাপ্পান)। বক্তৃতাশেষে নিজের কানের দুল এবং গলার সোনার হার তুলে দিয়েছিলেন নেতাজির হাতে। পরদিন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করে যোগ দিয়েছিলেন রানি ঝাঁসি ব্রিগেডে। এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার কথা অনেকেই লিখেছেন। তবে, সেইদিন সকালের অন্য এক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় কে আর দাসের স্মৃতিচারণে। শ্রীদাস ছিলেন কুয়ালালামপুরে ফৌজের অন্তর্গত ভারত ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টারের এক বিশেষ দায়িত্বে। নেতাজির কুয়ালালামপুরে থাকা-খাওয়ার সব দায়িত্বই ছিল দাসবাবুর। এদিকে ড. সেলভাম নামে জনৈক ধনী ভারতীয় দাসবাবুকে তার আগের দিনই

নেতাজির শোবার জন্য এক বিলাসবহুল পালঙ্ক দিয়ে গিয়েছিলেন। নেতাজি নিজের ঘরে ঢুকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন দাসবাবুকে। বলেছিলেন, আপনি খুব অন্যায় করেছেন। আপনি কি আমাকে কোনও যুবরাজ ভেবেছেন নাকি? মনে রাখবেন, আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সৈনিক মাত্র।

৭

কুয়ালালামপুরের চারদিন কোথা দিয়ে যে কেটে যায় বুঝতে পারি না। প্রাথমিকভাবে আমার পরিকল্পনা ছিল সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় ঢুকব জোহোর বাহ্রুতে। ধীরে ধীরে উঠতে থাকব দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পথে ছুঁয়ে যাব মালাক্কা এবং সেরেমবান। কিন্তু সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন আমার মনে হয় ২৬ জানুয়ারি যে করে হোক পৌঁছতে হবে কুয়ালালামপুর। আগে থেকেই জানা ছিল যে কেএলের ভারতীয়রা স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্র দিবস ইত্যাদি পালন করেন। এবং যেহেতু বছরের এই দু'-একটা দিনেই আমাদের দেশপ্রেম জেগে ওঠে, তাই মনে হয়েছিল, ওইদিন কেএল যেতে পারলে বলা যায় না— আমার এই প্রয়াস এখানকার ভারতীয়দের নজরে আসতে পারে এবং খুলে যেতে পারে তথ্যের নতুন কোনও দরজা। বলাবাহুল্য, আমার এই পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। দূতাবাসের অনুষ্ঠানে যাওয়ার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং একরকম আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অভিজিৎবাবু ও আনন্দরূপের সঙ্গে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই সম্পর্কের বাঁধন আসলে জড়িয়ে আছে নেতাজির প্রতি তাঁদের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায়। একটা ফোন নম্বর নিয়ে মালয়েশিয়া ঢুকেছিলাম, আর মাত্র চারদিনেই পেয়েছিলাম দু'জন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু— এই হল ভবঘুরে জীবনের যথার্থ প্রাপ্তি। অবশেষে, দুই নতুন বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে ২৯ জানুয়ারি রওনা হয়েছিলাম মালাক্কার উদ্দেশে।

কুয়ালালামপুরের নতুন ইন্টারসিটি বাসস্ট্যান্ডের নাম টার্মিনাল বেরসেপাদু সেলাতান। সংক্ষেপে টিবিএস। ঝকঝকে এই বাস টার্মিনাল থেকে দিনে ৫০০টা এক্সপ্রেস বাস ছাড়ে। একেবারে এয়ারপোর্টের মতো নিরাপত্তা এবং নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা। সম্প্রতি পেরু এবং মরক্কোর বিভিন্ন শহরেও আমি একইরকম অত্যাধুনিক বাস চলাচল ব্যবস্থা দেখেছি। যে-কোনও পাবলিক সার্ভিসের ব্যাপারে সবসময় অর্থনীতির দোহাই দেওয়াটা যেভাবে আমাদের জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। অবশ্য যে জাতি আজও বুক ফুলিয়ে বলে, পুষ্পক রথ হেলিকপ্টার ছিল এবং গণেশের সার্জারি আমাদের ঐতিহ্য, তাদের থেকে এটুকুই আশা করা যায়। তিনঘণ্টা পর পৌঁছে গিয়েছিলাম মালাক্কার প্রাচীন জনপদে। দেখি মালাক্কা নয়, এখানে সবাই তাকে ডাকে মেলাকা নামে। সম্ভবত, মেলাকা নামের একটা গাছ থেকেই এই নামকরণ। আবার কেউ অবশ্য বলেন, আরবি শব্দ মালাকাত বা মুলাকাৎ থেকে মেলাকা নামের জন্ম। তবে এই অঞ্চলের ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে অনায়াসেই চলে যাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর চোল রাজাদের সময়ে। দেখা যায়, ছ'শো বছর আগেও মেলাকা ছিল এক ছোট জেলেদের গ্রাম। আনুমানিক ১৪০০ সালে, একদিকে আয়ুথায়া (শ্যামদেশ— আজকের তাইল্যান্ড) এবং অন্যদিকে মাজাপাহিত (জাভা) রাজাদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সিঙ্গাপুরের রাজত্ব ছেড়ে এখানে আসেন ইস্কান্দার শাহ, ওরফে পরমেশ্বর। সেই থেকেই মেলাকা সুলতানাৎ-এর সূত্রপাত।

আমার মেলাকা আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সরকারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক চেট্টিয়ারদের খোঁজ করা। সিঙ্গাপুরের ইন্ডিয়ান হেরিটেজ সেন্টার থেকেই শুনেছিলাম মেলাকায় এক বিপুলসংখ্যক চেট্টিয়ার গোষ্ঠীর বাস। এই চেট্টিয়ার হল তামিলনাড়ুর এক ধনী সম্প্রদায় যাঁরা ব্রিটিশের হাত ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পা রেখেছিলেন। এঁরা ছিলেন সুদের কারবারি। আজ জানা গেছে, এই চেট্টিয়াররা দেশপ্রেমে উথলে উঠে নেতাজিকে সাহায্য করেননি। একরকম ধমকধামক খেয়ে এবং হাওয়া সুবিধের নয় বুঝেই আজাদ হিন্দকে তাঁরা অর্থসাহায্য করেছিলেন। শহরে পা রাখা মাত্রই হাজির হয়েছিলাম চেট্টিয়ারদের সবথেকে পুরনো দেবস্থান— পোয়াথা ভিনায়গার মুর্থি মন্দিরে। ১৭৮১-তে নির্মিত এই মন্দিরে ঢুকে দেখি অসম্ভব মিল মন্দিরের পাশের কাম্পুং ক্লিং মসজিদের সঙ্গে। কাম্পুং ক্লিং মসজিদ তৈরি হয়েছিল ১৭৪৮-এ এবং তার স্থাপত্যে চিন, মালয়, পর্তুগিজ ছাপ স্পষ্ট। মন্দিরে আরও একটা বিস্ময় আমার অপেক্ষায় ছিল। একটা ফলকে লেখা ছিল মন্দির আসলে চেট্টিয়াররা বানাননি। এ হল অন্য আর-এক চেট্টিদের উত্তরাধিকার। মন্দিরের পূজারিকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই বলেন, ওরা চেট্টিয়ার নয়, ছোট জাত। ওদের নাম চিট্টি। এখনও ওদের কয়েকঘর আছে মেলাকায়। কাম্পুং চিট্টি যাও, দেখতে পাবে।

কিলোমিটার দুয়েক হাঁটতেই পৌঁছে যাই কাম্পুং চিট্টি। রাস্তা পার হয়ে গলিতে ঢুকতেই দৃশ্যান্তর ঘটে যায়। মনে হয় এসে পড়েছি ভারতবর্ষের দরিদ্র কোনও পাড়ায়। ছোট ছোট টিনের চালাঘর, কিন্তু সাজানো এবং পরিষ্কার। গলি যেখানে শেষ সেখানে দেখি একটি মন্দির। তার পাশে একটা লাইব্রেরি ঘর। লাইব্রেরি দেখেই ঢুকে পড়ি। সব প্রশ্নের উত্তর সাধারণত লাইব্রেরিতেই পাওয়া যায়। স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে। আমার সাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসেন এক ভদ্রলোক। দেখতে হুবহু মালয়, কিন্তু নাম বলেন মুদালিয়ার। আমার বিস্ময় দেখে মুদালিয়ার হেসে বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ ভারত থেকে এসেছিলেন ছ'শো বছর আগে, সেই পরমেশ্বরের আমলে। পর্তুগিজরা আসার আগে পর্যন্ত সুলতানের রাজসভায় বেশ প্রভাবশালী ছিলেন তাঁরা। একজন তো প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। মূলত বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা। সুলতানের পতনের পর থেকে ব্যাবসা করার অধিকার চলে যায় আমাদের পূর্বপুরুষের হাত থেকে। বাধ্য হয়ে চাষবাস শুরু করতে হয়। ভারতের ভাষা জানি না, মালয় বলি আমরা। দেবদেবী কেবল হিন্দু রয়ে গেছে। এত কম আমাদের সংখ্যা যে মালয় সরকারের ভূমিপুত্র হিসেবে এখনও আমরা পরিচিতি পাইনি। আমরা তাই না ভারতের, না মালয়েশিয়ার। এখানে চেট্টিয়ারদের অনেক ক্ষমতা; কিন্তু ওদের কাছে আমরা নিচু জাত। ওরা চাইলে স্বজাতীয় বলে আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারত। আর স্বজনপোষণই তো তোমাদের ভারতের রীতি। একটা চাপা দুঃখ ভারী কুয়াশার মতো ভেসে থাকে আমাদের দু'জনের আলাপচারিতায়। দমবন্ধ লাগে, বিদায় জানিয়ে ফিরে আসি আলো ঝলমল টুরিস্ট পাড়ায়।

৮

মেলাকা আজ এক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শহর। তার ওপর শহর জুড়ে এখন চাইনিজ় নববর্ষের আলোকসজ্জা, অলিগলির দেওয়াল জুড়ে অপূর্ব সুন্দর সব গ্রাফিতি, স্ট্রিট আর্ট। সর্বত্র আমোদপ্রমোদ এবং ভূরিভোজের অঢেল আয়োজন। এসব দেখে পৃথিবীতে অভাব বলে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

পর্যটন ব্যাবসার এই এক অদ্ভুত দিক। যে যত ভাল ভার্চুয়াল রিয়ালিটি তৈরি করতে পারবে তার রেটিং তত বেশি। হাজার হোক, ব্যাবসা বলে কথা! স্ট্রিট আর্ট আসলে জন্ম নিয়েছিল গেরিলা আর্ট হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এই ব্যাপারটা প্রতিবাদের একটা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে। বার্লিন প্রাচীরের পশ্চিম দিকটা এই কারণেই একসময় রঙিন গ্রাফিতিতে ভরে উঠেছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত রেঙ্গুনে এবং ব্যাংককে, আমাদের বালক সেনাদের রাতের অন্ধকারে দেওয়ালে জয়হিন্দ লিখে পালানোটাও ছিল সেই গেরিলা আর্ট। আজ অবশ্য ব্যাপারটা বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম। এক একটা শহর যেন আর্ট গ্যালারি। মালয়েশিয়ায় এই ট্রেন্ড কয়েক বছর আগে পেনাং থেকে আরম্ভ হয়েছিল। এখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রথমে সুলতান পরমেশ্বর, তারপর যথাক্রমে পর্তুগিজ, ডাচ এবং ইংরেজদের রাজত্ব। প্রভুত্ব বদলের এই ঘনঘটায় মেলাকার মধ্যে যেন একটা নিজস্ব উদাসীন বিষণ্ণতা ছিল। তবে হতেও পারে এ আমার অবসাদ-বিলাস। তা না হলে, চিট্টি সম্প্রদায়ের দুর্দশার কথা ভেবে খামোখা আমার মন খারাপ হচ্ছিল কেন!

বিকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম প্রাচীন পর্তুগিজ দুর্গ আর চার্চের ধ্বংসাবশেষ জুড়ে। এমন সময় ফোন এল অভিজিৎবাবুর। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, ডা. মাধুরী মজুমদারের খোঁজ পাওয়া গেছে। উনি এখন ইপো-র এক হাসপাতালে। ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে আপনার সন্দেহই ঠিক। তবে অনেক বয়স হয়েছে তো, কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছেন। আপনি বরং একবার ফোন করে কথা বলে নিন। মালয়েশিয়াতে নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে সেরেমবানের ডা. ডি কে মজুমদারের নাম অনেকবার পড়েছিলাম। সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে নারায়ণ স্বামীও ওঁর কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, নেতাজি বহুবার ডা. মজুমদারের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেছেন। নারায়ণ স্বামী আরও বলেছিলেন, সেই ডা. ডি কে মজুমদার আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর কন্যাও ডাক্তারি করেন এবং মালয়েশিয়ার একজন সফল মহিলা। মালয়েশিয়া সরকার তাঁকে দাতুন উপাধি (অনেকটা বিলেতের লেডি উপাধির মতো) দিয়েছেন। এই তথ্যগুলো মাথায় নিয়ে গুগল করে আমার মনে হয়েছিল ইপো-র ডা. মাধুরী মজুমদারই সেরেমবানের সেই ডা. ডি কে মজুমদারের কন্যা। আমার সেই অনুমান অভিজিৎবাবুকে জানিয়েও ছিলাম। আজ নিঃসংশয় হয়ে যাবার পর, দেরি না করে ফোন করে ফেললাম। ধরলেন ওঁর সেক্রেটারি গোছের কেউ। বললাম, নেতাজি এবং আজাদ হিন্দের পথ অনুসরণ করছি। একবার শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। নেতাজি শব্দটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনের অন্যপ্রান্তে কী যেন একটা ঘটে গেল। বুঝতে পারলাম ডা. মাধুরী মজুমদারের মন অন্যসময়ে চলে গেছে। উনি বলতে লাগলেন, আরে নেতাজি বহুবার আমাদের বাড়ি এসেছেন। আমার মা রসগোল্লা বানাতেন। উনি খেতে ভীষণ ভালবাসতেন। মুহূর্তের বিহ্বলতা সামলে নিয়ে আমি বলি, দিদি আমি আসছি। কোথায় দেখা করব? উনি বলেন, ইপো-র পানতাই হাসপাতালে চলে এসো। অকস্মাৎ প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হয়ে অভিজিৎবাবুকে ফোন করে বললাম সব ঘটনা, বললাম আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই আমার।

পরদিন সকাল হতেই বাস ধরে সটান সেরেমবান। ডা. মাধুরী মজুমদার বলেছিলেন, সেরেমবানে নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত তাঁদের সেই বাড়ি আর নেই। তবু একবার সেরেমবান যাওয়া দরকার ছিল। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণ করার খবর এই সেরেমবানের মিলিটারি ক্যাম্পে বসেই নেতাজি শুনেছিলেন। ঘণ্টাদুয়েক পর সেরেমবান পৌঁছে প্রথম কাজ ছিল পরদিন ইপো যাবার টিকিটের ব্যবস্থা করা। দেখি চিনা নববর্ষের ছুটির জন্য বাস-ট্রেন সমস্ত ফুল। একটাও টিকিট নেই। অনেকটা আমাদের দুর্গাপুজোর

মতো অবস্থা। আনন্দরূপকে সমস্যার কথা জানাতেই বলল, কেএল হয়ে ব্রেক জার্নি করলে পেলেও পেতে পারেন। দাঁড়ান দেখছি। একটু পরেই আবার আনন্দরূপ ফোনে। বলল, কেএল থেকে ইপো, আপনার টিকিট কেটে দিয়েছি। বিকেল সাড়ে চারটের বাসে একটাই টিকিট পড়েছিল। আনন্দরূপকে ধন্যবাদ জানিয়েই একছুটে সেরেমবান রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশন থেকেই আজাদ হিন্দের সেনারা রেলগাড়ি বোঝাই হয়ে রওয়ানা দিত বর্মা সীমান্তের দিকে। স্টেশন থেকে খুব কাছেই ছিল আমাদের সেনাছাউনি। এটুকু জানতাম যে, সেই সেনাছাউনি ছিল রাসা অঞ্চলে। কিন্তু রাসা কোথায় এবং কী করে যাব ভাবছি, এমন সময় চোখে পড়ল এক তামিল ভারতীয়ের দোকান। এক কাপ কফি বলে দোকানের মালিক ভদ্রলোককেই জিজ্ঞেস করি রাসা এলাকাটা কোথায় এবং কতদূর। শুনে অবাক হয়ে ভদ্রলোক বলেন, রাসায় তো কিছু নেই! একটা মিলিটারি ক্যাম্প আছে— এই যা। ইউরেকা! বলে একচুমুকে কফি শেষ করে পৌঁছে যাই রাসা ক্যাম্প। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সান্ত্রি কিছুতেই ছবি তুলতে দেয় না। সব দেশেরই নিজস্ব নিরাপত্তার কারণে খুবই স্বাভাবিক সেটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হস্টেলে ফেরার পথ ধরি। ভাবি এখানেই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বিশাল ট্রেনিং ক্যাম্প। ক্যাম্প ইন চার্জ ছিলেন কার্নেইল সিং এবং স্টাফ অফিসার ছিলেন ডা. পি পি নারায়ণন। জাপানের সারেন্ডারের খবর পেয়ে এখান থেকেই আগস্ট মাসের ১২ তারিখে রাতারাতি গাড়ি চালিয়ে নেতাজিকে নিয়ে সিঙ্গাপুর ফিরেছিলেন তাঁর সেনাপতিরা। তারপর মেয়ার রোডের বাড়িতে বসেছিল জরুরি বৈঠক।

৯

পরদিন সেরেমবান থেকে ইপো পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। বাস টার্মিনাল শহরের বাইরে আমানজায়ায়। ম্যাপে দেখেছিলাম আমানজায়া থেকে ইপো বেশ দূরে। ট্যাক্সি নিতে হলে বেশ ট্যাঁকের জোর লাগবে ভেবে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই দেখি একটা ফাঁকা বাস এসে হাজির। বাসে উঠে ড্রাইভার সাহেবকে আমার গন্তব্য জানাতেই বললেন, বসে পড়ুন। এই বাসই যাবে, তবে মিনিট পনেরো পর। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে একঘণ্টা পর যখন হস্টেলের দরজায় এসে পৌঁছলাম, তখন ডিউটি সেরে ম্যানেজার বাড়ি চলে গেছেন। আমি এসে গেছি এসএমএস করে জানাতেই দরজা খোলার পাসওয়ার্ড আমার কাছে চলে এল। স্নান সেরে শুতে যাবার আগে আলাপ হল সোমালিয়ার যুবক আলির সঙ্গে। আলি এখানে এসেছে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। যেহেতু আফ্রিকা, তাই আলাপ গড়াল আলোচনায়। অনেক রাত পর্যন্ত সোমালিয়া এবং সোমালিল্যান্ডের দুর্ভাগ্য ভাগের উত্তরাধিকার এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চলল আমাদের আলাপচারিতা। শুতে যাবার আগে মনে মনে সাজিয়ে নিলাম পরদিনের পরিকল্পনা।

সকালে উঠে প্রথমেই ছুটলাম ইপোর গ্রিনটাউনের গুরুদোয়ারায়। এই গুরুদোয়ারা তৈরির এক সুন্দর গল্প শুনেছিলাম, তাই আমার দিনের শুরু এখানেই হবে ঠিক করে রেখেছিলাম। ১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের অষ্টম ডিভিসন ইপোতে আসে তখন গ্রিনটাউনের এক টিলা ঘিরে ছিল তাদের সেনাছাউনি। কর্নেল মাহতাব উল্ক ছিলেন কমান্ডিং অফিসার। গুরুদোয়ারা তৈরির একটা প্রস্তাব ছিলই সৈনিকদের। এদিকে ছাউনিতে একটি মসজিদ আগে থেকেই ছিল। কর্নেল মাহতাব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন

কোনও ধর্মস্থানই ছাউনির মধ্যে থাকবে না। তাই ঠিক হয়েছিল গুরুদোয়ারা তৈরি হবে ছাউনির পাশে টিলার মাথায়। প্রত্যেক শিখ জওয়ান একশোটা করে ইট বয়েছিল টিলার মাথায়। তারপর নিজেরাই তৈরি করেছিল তাদের সাধের গুরুদোয়ারা। একই ভাবে মুসলমান সৈনিকেরা মসজিদ সরিয়ে নিয়েছিলেন ছাউনির বাইরে। এমনই বোঝাপড়া ছিল আজাদ হিন্দের সৈনিকদের মধ্যে। ধর্ম কোনওদিনই তাঁদের মধ্যে বিভেদ আনতে পারেনি। পারেনি, তার মূল কারণ ছিলেন নেতাজি নিজে। ফৌজের গোড়াপত্তন থেকেই নেতাজি বুঝিয়েছিলেন, টলারেন্স নয়, হতে হবে ইনক্লুসিভ। অন্যের ধর্মকে সহ্য করা আবার কী কথা! অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে এবং ভালবাসতে হবে। ফৌজে তাই ইদের দিনে হিন্দুরা আমন্ত্রণ জানাতেন মুসলিমদের, রান্না হত পোলাও। আর দিওয়ালির দিনে বিরিয়ানির দাওয়াত দিতেন মুসলমান সৈনিকরা তাঁদের হিন্দু ভায়েদের।

টিলার মাথায় সেই গুরুদোয়ারা আজও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়েছে তার পরিধি, বেড়েছে বৈভব। টিলা ঘিরে ছড়িয়ে আছে আজও সেনাছাউনি, তবে এখন তা মালয়েশিয়ার। গোটা গুরুদোয়ারা চত্বরে কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। স্বাভাবিকভাবেই একটু ইতস্তত করছিলাম ভিতরে ঢোকার ব্যাপারে। খুব একটা তাড়াও ছিল না। তাই উঠোনে বসে ছিলাম। এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল গুরুদোয়ারার সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন একজন বয়স্ক শিখ। সন্দেহ নিরসনের জন্য এগিয়ে গিয়ে আমার জানা ইতিহাস ওঁকে বলতেই হেসে উঠলেন সর্দারজি। বললেন, হ্যাঁ, এই সেই জায়গা! চলো ভিতরে আমার সঙ্গে। মাথায় টুপিটা পরে নাও। *গ্রন্থসাহিব-এর* সামনে বসবে চলো। আমি প্রণামটা সেরে নিই, তারপর কথা বলছি। প্রণাম সেরে বাইরে আসার পর ভদ্রলোক বললেন, তুমি আজাদ হিন্দের কথা বলছিলে, তাই না? আমার গল্পটা অবশ্য একটু অন্যরকম। আমার নাম সুরেন সিং। যুদ্ধের কথা আমার কিছুই মনে নেই কারণ আমি তখন খুব ছোট। বাবা হরি সিং ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে। কুয়ালালামপুরের কাছে ক্লাং বলে একটা জায়গায় থাকতাম আমরা। জাপানি আক্রমণের সময় ব্রিটিশ একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কোতা ভারুর দিক থেকে যখন জাপান দ্রুত মালয় উপমহাদেশ দখল করে ফেলেছে, তখন একদিন ব্রিটিশ এক যুদ্ধবিমান ভুল করে তাদের নিজেদের একটা ক্যাম্পকে বোমাবর্ষণ করে গুঁড়িয়ে দেয়। আমার বাবা সেই ক্যাম্পেই ছিলেন। আমার তখন মাত্র দু'বছর বয়স। পিতৃবিয়োগের এই মর্মান্তিক কাহিনি আমাকে একেবারে হতবাক করে দিয়েছে দেখে কথা ঘুরিয়ে দেন সুরেন সিং। বলেন, কোই গল নেহি পুত্তর। আভি কাহাঁ যাওগে? পানতাই হাসপাতাল বলতেই, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিজের গাড়িতে স্টার্ট দেন সুরেন।

গুরুদোয়ারা থেকে কিলোমিটার খানেক হাঁটতেই এসে পড়ি হাসপাতাল। রিসেপশনে এসে কথামতো ফোন করি ডা. মাধুরী মজুমদারের সেক্রেটারিকে। সেক্রেটারি বলেন, সকাল থেকেই আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছেন ম্যাডাম, চলে আসুন। তিনতলায় ভিআইপি কেবিনে ঢুকতেই এক মিষ্টি হাসি আমার প্রতীক্ষায় ছিল। যেন কতদিনের চেনা! কলকাতা থেকে আসছ তুমি? প্রশ্ন ডা. মজুমদারের। হ্যাঁ, বলে প্রণাম করেই আমি বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। ডা. মজুমদার ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন তাঁর ছেলেবেলায়। গড়গড় করে বলে চলেছেন, আমি বাক্যহারা হয়ে শুনছি। বলছেন, নেতাজি যে কতবার আমাদের সেরেমবানের বাড়ি এসেছেন তার হিসেব নেই। মা পায়েস করতেন, রসগোল্লা বানাতেন নেতাজি এলেই। কত জাপানি অফিসারও যে নেতাজির সঙ্গে এসেছেন, কী বলব! বাবা ডা. দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদার প্রথম থেকেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের বরিষ্ঠ নেতা ছিলেন। মা ছিলেন রানি ঝাঁসি বাহিনীর সেরেমবান শাখার প্রধান। তাই

আমিও একরকম জোর করে, বয়স বাড়িয়ে ভরতি হয়েছিলাম বালিকা সেনায়। পেনাং-এ তিন মাসের ট্রেনিং হয়েছিল। এত ছোট ছিলাম যে দু'হাত দিয়েও পিস্তল সোজা করে তাক করতে পারতাম না। সে এক সময় ছিল বুঝলে অনিন্দ্য! বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে যায় ডা. মজুমদারের।

১০

ডা. মাধুরী মজুমদারের বিছানার পাশে বসেছিলাম। ডা. মজুমদার বলছিলেন, মালয়েশিয়ায় প্রথমবার জাপানি আক্রমণের কথা। বলছিলেন, আমার তখন মাত্র সাত বছর বয়স। জাপানিরা উত্তরদিক থেকে এক এক করে শহর দখল করছিল। আমাদের কাছে খবর আসছিল রোজই। যেদিন সেরেমবানে জাপানি বোমা পড়ল, সেদিনই আমরা সবাই একটা করে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। উলু তেমিয়াং-এর গভীর অরণ্যে, রাবার প্লান্টেশনের একটা ঘরে আমাদের ঠাঁই হল। তিনমাস এইভাবে জঙ্গলে ছিলাম বুঝলে? খাবারদাবারের নিশ্চয়তা ছিল না। জঙ্গলের ফলপাকুড়, জংলি শাকপাতা সব চিনে গিয়েছিলাম। তিনমাস পর সেরেমবান ফিরে দেখি আমাদের ঘরবাড়ি, বাবার ক্লিনিক সব বিধ্বস্ত। আজ মনে হয়, আমাদের মানুষ করতে গিয়ে কত কষ্টই না বাবাকে করতে হয়েছিল! এরপর অবশ্য ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়েছিল, আমরাও আবার স্কুলে যাচ্ছিলাম। নেতাজি আসার পর থেকে সব অন্যরকম হয়ে গেল। এই জাপানিরাই আমাদের সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল। জেনারেল ইয়ামাশিতা, যাঁকে 'টাইগার অফ মালয়' বলা হত, তিনি তো প্রায়ই আমাদের বাড়ি খেতে আসতেন। মায়ের হাতের রান্না একবার যে খেয়েছে তার ভাল না লেগে উপায় ছিল না। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ বাবা নিখোঁজ হয়ে গেলেন। আমরা তো দিশেহারা! শুনতে পেলাম জাপানি সিক্রেট পুলিশ নাকি বাবাকে ব্রিটিশের চর সন্দেহে ধরে নিয়ে গেছে সিঙ্গাপুর। সেসময় গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি ছিল মৃত্যু। এইরকম এক চরম দুর্দশার সময়ে বাবা জেল থেকে কোনওমতে একটা হাতচিঠি পাঠাতে পারেন নেতাজিকে। ভাগ্যক্রমে নেতাজি তখন সিঙ্গাপুরেই ছিলেন। চিঠি পেয়েই নেতাজি নিজে এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যান ডা. দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদারকে। নেতাজি সেদিন জাপানি কেম্পেতাইকে বলেছিলেন, হাও ডেয়ার ইউ টাচ হিম! হি ইজ় মাই ম্যান। তারপর নিজের গাড়িতে বসিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে আসেন সেরেমবান। এই ছিলেন নেতাজি। ডা. মাধুরী মজুমদারের সেক্রেটারি ব্যস্ত হচ্ছিলেন। আরেকজন ভিজ়িটর নীচে এসে গেছেন। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আমার জন্য বরাদ্দ দশ মিনিট কখন যে এক ঘণ্টা হয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন দিদি, বলে বেরিয়ে এসেছিলাম।

পরদিন ইপো থেকে বাসে বাটারওয়ার্থ, সেখান থেকে ফেরি পার হয়ে পেনাং দ্বীপ। দ্বীপে পা রাখা মাত্রই তার কলোনিয়াল স্থাপত্যের বাড়ির সারি বলে দিচ্ছিল এই দ্বীপনগরীর আনাচে-কানাচে রয়েছে অনেক ইতিহাস। হস্টেল যাবার পথেই পড়ল সিটি হলের সেই মাঠ, যেখানে ১৯৪৩-এর আগস্ট মাসে এক জনসভায় কুড়ি লক্ষ স্থানীয় মুদ্রা দান হিসেবে উঠেছিল আজাদ হিন্দ সরকারের তহবিলে। তবে এই মাঠ নয়, পেনাং-এ আমার আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ ইনস্টিটিউট খুঁজে বার করা। এই স্বরাজ ইনস্টিটিউট ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর বৃত্তি এবং সমস্ত রকম গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং সেন্টার। বোমা বানানো, ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার তৈরি, মুখোমুখি খালি হাতে লড়াই, গুপ্ত কোড তৈরি করে ভারতের আন্ডারগ্রাউন্ড

বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন— এই ছিল ইনস্টিটিউটের কাজ। স্বরাজ ইনস্টিটিউটেরই এক প্রবাদপ্রতিম যোদ্ধা ছিলেন আমেরিক সিং। পেনাং থেকে পোর্ট ব্লেয়ার হয়ে, সাবমেরিনে ওড়িশার উপকূলে নেমে কীভাবে তাঁদের পাঁচজনের দল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এক সহযোদ্ধা তুহিন মুখার্জি তাঁদের সঙ্গে বেইমানি করার পরেও কীভাবে তাঁরা প্রাণে বেঁচেছিলেন— এই নিয়েই পৃথক একটা রোমহর্ষক চিত্রনাট্য লিখে ফেলা যায়। পবিত্রমোহন রায়ের নেতৃত্বে এই গুপ্তদলের কাজ ছিল কলকাতায় বিপ্লবীদের একটা গুপ্ত ঘাঁটি তৈরি করা। আজ্ঞে হ্যাঁ, হলিউড ছবির মতো আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজেরও দুঃসাহসী সিক্রেট এজেন্টরা ছিল। আজকে ধোঁয়াশায় ঢাকা এক সার্জিকাল স্ট্রাইকের ভিত্তিতে বলিউড জমে উঠতে দেখে মনে হয়, আমাদের এই প্রকৃত হিরোদের কথা তো কেউ জানেন না! জানানোও হয়নি। উলটে গুমনামি বাবা গোছের সিনেমা বানিয়ে, নেতাজির কাজের দিক থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে সেই গসিপের দিকেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কুয়ালালামপুরে নারায়ণ স্বামী, কিংবা ইপোয় ডা. মজুমদার কেউই পেনাং-এর এই স্বরাজ ইনস্টিটিউট ঠিক কোথায় ছিল বলতে পারেননি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই ঝাপসা হয়ে যায়। এদিকে আমার পেনাং যাবার দিন যত এগিয়ে আসছিল, তত ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম। পেনাং যাব, অথচ সেই স্বরাজ ইনস্টিটিউটের বাড়ি দেখতে পাব না— তা কি হয়? অবশেষে, ইপো থেকে পেনাং বাসে আসার পথে, বালক সেনা নারায়ণ স্বামীর দেওয়া একটা বইতে হরবক সিং-এর লেখা প্রবন্ধে স্বরাজ ইনস্টিটিউটের হদিশ পেয়েছিলাম। হরবক সিং ছিলেন স্বরাজ ইনস্টিটিউটের ওয়্যারলেস প্রশিক্ষক। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে হরবক আজাদ হিন্দ সেনায় যোগ দিয়েছিলেন। হরবক লিখেছিলেন, পেনাং ফ্রি স্কুলই ছিল তাঁদের সেই ট্রেনিং সেন্টার— স্বরাজ ইনস্টিটিউট। জর্জটাউনের হস্টেলে পৌঁছে, শহরের ম্যাপ ঘাঁটতেই পেনাং ফ্রি স্কুল দেখা দিল। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম স্কুলে। গিয়ে দেখি বিশাল ক্যাম্পাস। একদিকে খেলার মাঠ, ছোট গ্যালারি; আর অন্যদিকে প্রাচীন স্কুল বিল্ডিং। বাইরের ফলক বলে দিচ্ছিল মাত্র তিন বছর আগেই শতবর্ষ পূর্ণ করেছে এই স্কুল। একে রবিবার, তায় চাইনিজ় নিউ ইয়ারের ছুটি। স্কুলপ্রাঙ্গণ খাঁখাঁ করছিল। তিন-চারটি ছেলে মাঠে ফুটবল খেলছিল। খেলা শেষ হতে ওদেরই একজনকে বললাম, তোমাদের স্কুল দেখতে ভারত থেকে এসেছি। শুনে অবাক ছেলেটি বলল, সেকি শুধু স্কুল? পেনাং ঘুরবেন না? একটু মজা করার জন্যই তখন ওকে আমাদের স্বরাজ ইনস্টিটিউটের আমেরিক সিং-এর কথা একটু বললাম। বললাম, জানো আমেরিক আজও বেঁচে আছেন? এবছর তিনি একশোয় পড়বেন। বিস্ময় দেখেছিলাম ছেলেটির চোখে— অবিশ্বাস দেখিনি।

১১

আমেরিক সিং-এর গল্প শোনার পর ছেলেটি আমার পিছু ছাড়তে চাইছিল না। নাম জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, আমার নাম আকিল। আকিল মানে হল জ্ঞানী কিংবা বুদ্ধিমান লোক। তাই আমার প্রশ্নের জবাব এবার তোমাকে দিতে হবে। আমি বলেছিলাম, বাড়ি যাও, মা বকবে না? ছেলেটির জবাব, চাইনিজ় নিউ ইয়ারের জন্য দু'দিন স্কুল ছুটি এখন। কোনও তাড়া নেই। তুমি তো ইন্ডিয়ান, তাই না? আমি হ্যাঁ বলতেই আকিল বলেছিল, আমাদের দিওয়ালিতেও দু'দিন ছুটি থাকে। আমার দু'-একজন ইন্ডিয়ান বন্ধুও আছে, তবে তারা

এখন বেড়াতে গেছে। আমি আকিলকে বলেছিলাম, তোমাদের ইংরেজি শব্দের বানান লেখার পদ্ধতি আমার ভীষণ পছন্দ। এই যেমন train হয়ে গেছে tren, bus হল bas, college হয়েছে kolej, station হয়েছে stesen— এটা আমার ভীষণ পছন্দ। শুনে একগাল হেসে আকিল বলে, উলটোটাও আছে। আমাদের মালয় ভাষা থেকেও একগাদা শব্দ ইংরেজরা নিয়েছে তুমি জানো? আমার কোনও ধারণা নেই বলতেই আকিল বলে, এই যে ম্যাকডোনাল্ডসে গেলেই দেয়— কেচাপ, বাটারওয়ার্থ থেকে যা চেপে এই দ্বীপে এলে— সেই লঞ্চ; দুটোই মালয় শব্দ থেকে এসেছে। শুনে দু'জনেই খুব একচোট হেসেছিলাম। মন দিয়ে পড়াশুনো করো আর সুযোগ পেলেই ফুটবল খেলো, বলে আমি বিদায় নিয়েছিলাম।

পেনাং ফ্রি স্কুল থেকে ঢালু পথ নেমে গিয়েছিল জর্জটাউনের টুরিস্ট পাড়ার দিকে। হস্টেল ফেরার পথে আমার মনে পড়ছিল ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা। সুনীতিবাবু মনে করতেন ভারতবর্ষের এই ভাষাগত বৈচিত্র্যের বাধা এড়ানোর একমাত্র উপায় রোমান হরফ ব্যবহার করা। ১৯৩৫-এ *রোমান অ্যালফাবেট ফর ইন্ডিয়া*— নামে তিনি একটি বইও লিখেছিলেন। নেতাজির সঙ্গে সুনীতিবাবুর দীর্ঘ আলোচনাও এই বিষয়ে হয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ, ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসে হিন্দি এবং উর্দুর মিশ্রণে এক হিন্দুস্তানি ভাষা রোমান হরফে দেশের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে চালু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন নেতাজি। তিনি বলেছিলেন, জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে গেলে একটাই লিপি এবং একটাই ভাষার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, নেতাজির সেই প্রস্তাবে সেদিন ভারতে কেউ কর্ণপাত করেননি। তার কয়েক বছর পরেই আজাদ হিন্দ ফৌজে নেতাজি এই রোমান হরফে লেখা হিন্দুস্তানি ভাষা প্রচলন করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর প্রস্তাব কতটা কাজের এবং বাস্তবমুখী ছিল। ফৌজের সেনারা বেশিরভাগই ছিল নিরক্ষর। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তামিল, তেলেগু, গুরমুখী, বাংলা এবং উর্দুভাষী মানুষ। কিন্তু সকলেই দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনে থাকার ফলে রোমান হরফ পড়তে পারতেন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর, ব্রিটিশরাও নেতাজির দেখাদেখি এই রোমান লিপিতে হিন্দুস্তানি চালু করে দেয়। যুদ্ধকালীন সমস্ত প্রচারে, মিত্রশক্তি এবং অক্ষশক্তি— দু'পক্ষকেই দেখা যায় সুনীতিবাবুর এই উপদেশ মেনে নিতে। স্বাধীনতার সাত দশক পরেও হিন্দি ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হতে পারেনি। নেতাজি তখনই এটা বুঝেছিলেন।

পেনাং থেকে পরদিন কাকভোরে ফেরি পার হয়ে চলে এসেছিলাম বাটারওয়ার্থ। ধরেছিলাম পাদাং বেসার যাবার ট্রেন। বাটারওয়ার্থ থেকে পাদাং বেসার দু'ঘণ্টার জার্নি। স্টেশন থেকে হাঁটা দূরত্বে তাইল্যান্ড সীমান্ত। আমার পরিকল্পনা ছিল সেদিনই সীমান্ত পার হয়ে তাইল্যান্ডের হাতইয়াই শহরে পৌঁছে যাবার। ভারত ছাড়ার আগে এবং পরে কুয়ালালামপুরে থাকাকালীন তাই দূতাবাসেও খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এই পাদাং বেসার সীমান্ত দিয়ে ভারতীয়দের অন অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়া হয়। সেজন্য নিশ্চিন্ত ছিলাম। পাদাং বেসারে একদিকে মালয়েশিয়ার সীমান্ত পোস্ট, অন্যদিকে তাইল্যান্ডের। মাঝখানে দু'কিলোমিটার নো ম্যানস ল্যান্ড। মালয়েশিয়ার সীমান্তে পৌঁছতে অফিসার বললেন, আগে আপনি তাইল্যান্ডের সীমান্তে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন ওরা আপনাকে অন অ্যারাইভাল ভিসা আদৌ দেবে কি না? দেবার তো কথা, বলতেও কোনও কাজ হয় না। অগত্যা, কোনও এক্সিট স্ট্যাম্প ছাড়াই নো ম্যানস ল্যান্ড পার হয়ে আমি পৌঁছে যাই তাইল্যান্ডের দোরগোড়ায়। আগমনি ভিসা অর্থাৎ ভিসা অন অ্যারাইভালের জন্য এক পৃথক অফিস। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আমার ডাক আসে। আমাকে দেখেই অফিসার বলে দেন, দুঃখিত, হবে না। আমি যতই বোঝাতে যাই যে

আমি আপনাদের দূতাবাসে কথা বলে এসেছি এবং ওঁদের সার্কুলার দেখাই, ততই ভদ্রলোক আরও জোরে ঘাড় নেড়ে বলেন, না, না, হবে না। ইউ গো ব্যাক, ইউ ফ্লাই। অগত্যা যোগাযোগ করি আমাদের হাই কমিশনের অভিজিৎবাবুর সঙ্গে। অভিজিৎবাবুর সাগ্রহ তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল চৌহান আমার সংকটের কথা জানান তাঁর পরিচিত এক তাই কর্নেলকে। একটু পরেই সেই তাই কর্নেলের ফোন আসে আমার কাছে। ওঁকে সব খুলে বলতেই উনি বলেন আবার একবার ভিতরে গিয়ে ওই ইমিগ্রেশন অফিসারকে আমার কথা বলুন, আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিন। বলুন আমার নাম কর্নেল আরুন, বলুন তাই এমব্যাসি থেকে বলছি। কর্নেল আরুনের কথায় বুকে বল আসে, আমি আবার ঢুকে পড়ি সেই অফিসারের ঘরে। বলি কর্নেল আরুন কথা বলতে চাইছেন, প্লিজ় ফোনটা ধরুন। ভেবেছিলাম কর্নেল শুনে ঘাবড়ে গিয়ে আমাকেই স্যালুট করে ফেলতে পারেন এই ইমিগ্রেশন অফিসার, কিন্তু দেখলাম ভবি ভোলবার নয়। বললেন, কোনও কর্নেল চিনি না, ফোনও ধরতে পারব না। কর্নেল আরুন বললেন, আমার আর একজন চেনা অফিসার আছে, কিন্তু সে অন্য এক সীমান্তে। আমি দেখলাম, এ তো মহা বিপদ! পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কর্নেল আরুনের চেনা সীমান্তে গিয়েও যে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না, তা হলফ করে কে বলতে পারে?

সীমান্তের সংকট কাটিয়ে ওঠার দুটো রাস্তা খোলা ছিল। এক, কুয়ালালামপুরে গিয়ে তাই দূতাবাসে ভিসার আবেদন করে, দু'দিন পরে আবার পাদাং বেসারে ফিরে আসা। তারপর প্রাথমিক প্ল্যানমাফিক হাতইয়াই থেকে ট্রেনে বা বাসে ব্যাংকক। সেক্ষেত্রে পাঁচ-ছ'দিন জলাঞ্জলি যাবে, হবে আনুষঙ্গিক অর্থনাশ। দুই, কুয়ালালামপুর থেকে সরাসরি ব্যাংকক উড়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে সময় নষ্ট হবে না এবং ব্যাংকক এয়ারপোর্টে ভিসা পেতে কোনও সমস্যা হবে না। তবে অর্থনাশ দুই ক্ষেত্রেই অনিবার্য। নো ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা খুব প্রয়োজন ছিল। নষ্ট করার মতো দিন বা অর্থ কোনওটাই যখন নেই তখন দ্বিতীয় পন্থাই নেব স্থির করলাম। সীমান্ত থেকে রেলস্টেশন হেঁটে আসার পথেই হোয়াটসঅ্যাপে ভ্রাতৃপ্রতিম শুভকে জানালাম সংকটের কথা। আমার ট্রেন বাটারওয়ার্থ পৌঁছনোর আগেই কুয়ালালামপুর-ব্যাংকক টিকিট ই-মেলে আমার কাছে চলে এল। বাটারওয়ার্থ থেকে মাঝরাতের বাস কাকভোরে পৌঁছে দিল কুয়ালালামপুর। মনে হল কত চেনা একটা জায়গা। রাতে আরও একবার দেখা হল আনন্দরূপ এবং তার আরও দুই সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে। বেশ খানিকটা আড্ডা এবং এক বাংলাদেশি রেস্তরাঁয় খাওয়ার পর আসল চমক দিল আনন্দরূপ একবাটি মিষ্টি দই খাইয়ে। অনেকদিন পর আমার বাঙালি সুইট টুথ এক অসম্ভব পরিতৃপ্তি পেল। বিদেশে এমন দই, এক মিনিটের স্বর্গীয় নীরবতা আনতে পারে যখন-তখন।

তাইল্যান্ড পর্ব

১

পরদিন ব্যাংককের ফ্লাইট মাঝরাতে। এয়ারপোর্ট শহর থেকে বেশ দূরে। কেএল সেন্ট্রাল থেকে বাসেই লাগে একঘণ্টার একটু বেশি। চেক-ইন, ইমিগ্রেশন, সিকিউরিটি করে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা। তারপর ঘণ্টাদেড়েকের এক ছোট্ট উড়ান পৌঁছে দিল ব্যাংককের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দর। লাইন দিলাম অন অ্যারাইভাল ভিসার কাউন্টারে। নিয়মাবলিতে লেখা ছিল অন অ্যারাইভাল ভিসার জন্য হোটেল বুকিং, রিটার্ন টিকিট এবং দশ হাজার তাই বাট সঙ্গে রাখা আবশ্যক। হস্টেল একটা বুক করা ছিল। একটা আজগুবি রিটার্ন টিকিটও ছিল। ছিল না দশ হাজার বাট। ঠিক করে রেখেছিলাম, টাকার কথা জিজ্ঞেস করলে এমন একটা ভাব দেখাব যে ওদের মনে হবে ওই টাকা আমার কাছে নস্যি। সাধারণত ইমিগ্রেশন অফিসাররা একটু গোমড়া এবং খিটখিটে স্বভাবেরই হয়ে থাকেন, কিন্তু সেদিন কী যে হল কে জানে! এক তরুণী ভিসা অফিসার আমার সঙ্গে এমন মিষ্টি ব্যবহার করলেন যে টাকার প্রসঙ্গই উঠল না। তবে তাইল্যান্ড জানে, আসল কথা হল, অতিথি দেবোভব নয়, অতিথি দেবেভাব— মানে, অতিথি কী দেবে, ডলার না পাউন্ড, সেইটা ভাবো! ট্যুরিজ্‌ম ব্যাবসার ব্রহ্মজ্ঞান তাইদের অনেকদিন আগেই হয়েছে।

পাসপোর্টে ভিসার স্ট্যাম্প পড়তেই আমি যথাসাধ্য মিষ্টি হেসে, ধন্যবাদ এবং বিদায় জানিয়ে অ্যারাইভাল লাউঞ্জ থেকে আমার রুকস্যাক নিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা খোঁজা শুরু করলাম। সবে রাত একটা। সকাল ছ'টায় প্রথম বাস ছাড়বে এয়ারপোর্ট থেকে। দেখলাম আমার মতো একই ফন্দি অনেকেরই। তবে সারসার সাজিয়ে রাখা চেয়ারে শুয়ে পড়ার একটা বিশেষ অঙ্ক ছিল। দেখলাম শরীরকে শয্যাগত করতে গড়ে তিনটে করে চেয়ার প্রত্যেকের লাগছে। অর্থাৎ ১:৩ হিসেব করে সবাই ছড়িয়ে পড়ছেন। অতি দ্রুত শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আমিও একটা তিনের সেট দখল করে শুয়ে পড়ি।

দিনের প্রথম বাস আমাকে পৌঁছে দেয় মহাছাই রোডের হস্টেলে। বেলা দুটোর আগে চেক-ইন সম্ভব নয়, তাই ব্যাগ রেখে বেরিয়ে পড়ি আমার কাজে। ব্যাংককে আমার প্রথম কাজ ছিল তাই-ভারত কালচারাল লজ খুঁজে বার করা। হাতে ম্যাপ নিয়ে গলিঘুঁজি ঘোরার পর পেয়েও যাই। দেশনায়কের পথে বেরিয়ে প্রত্যেকবারই যখন এরকম কোনও একটা বাড়ি বা বিন্দু আমি খুঁজে পেয়েছি, আমার মনে হয়েছে যেন কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। ঠিক যেন ড্যান ব্রাউনের কোনও উপন্যাস। তবে এই গুপ্তধন আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং প্রকৃত সম্পদ।

বড় দরজা, একফালি উঠোন, তারপর সিঁড়ি উঠে গেছে এক ছোট হলঘরে। লেখা আছে স্বামী সত্যানন্দ পুরী লাইব্রেরি। বুঝি সঠিক জায়গাতেই এসেছি। মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের ব্রহ্মচারী কৈলাসম, তথা স্বামী

সত্যানন্দ ছিলেন গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। আর ইনি হলেন পুরী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায়ের এই একনিষ্ঠ যোদ্ধার গৃহীনাম ছিল প্রফুল্লচন্দ্র সেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এই অধ্যাপক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে ১৯৩২-এ তাইল্যান্ড এসেছিলেন। ব্যাংককের চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় মাত্র ছ'মাসে শিখেছিলেন তাই ভাষা এবং অনুবাদ করেছিলেন *রামায়ণ*। ১৯৩৯-এ স্বামী সত্যানন্দ স্থাপন করেন এই তাই-ভারত কালচারাল লজ। দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানই ছিল এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরেই উনি গড়ে তোলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন জ্ঞানী প্রীতম সিং, দেবনাথ দাস এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সঙ্গে। মূলত স্বামী সত্যানন্দের উদ্যোগেই জাপানি ইন্টেলিজেন্স অফিসার ফুজিওয়ারার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে প্রীতম সিং-এর। আজাদ হিন্দ ফৌজের ধারণার জন্ম থেকে মোহন সিং-কে নিয়ে প্রথম ফৌজ গঠন— সবেতেই ছিল স্বামী সত্যানন্দ তথা তাই-ভারত কালচারাল লজের প্রত্যক্ষ সংযোগ। ১৯৪২-এর মার্চ মাসে টোকিও কনফারেন্সে যোগ দিতে যাবার সময় এক বিমান দুর্ঘটনায় প্রীতম সিং এবং সত্যানন্দ পুরী দু'জন একই সঙ্গে মারা যান। আজ সেই ঐতিহাসিক তাই-ভারত কালচারাল লজের বড় গ্রিলের গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই এক তাই ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। কেউ আছেন, জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ম্যাডামকে খুঁজছেন? আপনি লাইব্রেরি ঘরে বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।

২

তাই-ভারত কালচারাল লজের লাইব্রেরিতে বসেছিলাম। ঠিক কী ধরনের বইপত্র এঁরা রাখেন সে ব্যাপারে একটা কৌতূহল ছিলই। দেখলাম ইংরেজি, হিন্দি এবং তাই ভাষার বিভাগে ছড়িয়ে রয়েছে ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য এবং ভাষাচর্চার নানা সংগ্রহ। নেহরুর *ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া*-র পাশেই রাখা আছে *নেতাজি রচনাসমগ্র*। হলঘরের একপ্রান্তে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সদ্য হয়ে যাওয়া নেতাজি জন্মজয়ন্তীর ব্যানার। বেশ কিছু বড় ছবি ফ্রেমবন্দি করে রাখা আছে দেওয়াল জুড়ে। সেই ছবির সরণিতে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, তাই মহারাজা, যুবরাজরা যেমন আছেন, তেমন আছেন রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গাঁধী, জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজি। এক সুন্দর সাদাকালো ছবি এখানে তাঁর। বইয়ের গন্ধ আর পুরনো ছবির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে আছি এমন সময় ঘরে ঢুকলেন অন্য এক ভদ্রমহিলা। বুঝলাম, ইনিই সেই ম্যাডাম। নিজের পরিচয় দিয়ে, কী উদ্দেশ্যে আমার এখানে আসা তা বলার আগেই আমাকে থামিয়ে স্মিত হেসে ম্যাডাম বললেন, আপনি বাংলাতেও কথা বলতে পারেন। আমার নাম রত্না তালুকদার। গত চল্লিশ বছর ধরে এই তাই-ভারত কালচারাল লজের সঙ্গে যুক্ত। আসুন আমার অফিসঘরে বসবেন। বাকি কথা ওখানেই শুনব। ম্যাডামের মধ্যে এমন এক সরল আন্তরিকতা ছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি আমার রত্নাদি হয়ে গেলেন। রত্নাদি বললেন, আপনি একটু ঘুরে আসুন— এই তো কাছেই রয়্যাল হোটেল, নেতাজি ব্যাংকক এলে সাধারণত ওখানেই উঠতেন। আমি জিজ্ঞেস করি, ওখান থেকে সিলোপাকর্ন ইউনিভার্সিটি কতদূর? বেশ কাছে শুনেই উঠে পড়ি। বলি, আমি ঘুরে আসি তা হলে। রত্নাদি বলেন, তাই আসুন, আমি ততক্ষণে দেখি আপনার সঙ্গে এক বালক সেনার যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায় কি না!

উৎফুল্ল মনে হাঁটা লাগাই রয়্যাল হোটেলের পথে। মিনিট দশেক হাঁটতেই একেবারে রাস্তার ওপর বিরাট হোটেল। দেখেই বোঝা যায় এই হোটেল একদিন সার্থকনামা ছিল। আজ হতশ্রী। সটান ভিতরে ঢুকে পড়ি, জিজ্ঞেস করলে ঘরের ভাড়া জানতে এসেছি বলব, মনে মনে প্ল্যান করে রাখি। কেউ কিছুই বলে না, ভুরু কুঁচকে তাকায়ও না কেউ। তাই সাহস করে রিসেপশনে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করি, এই হোটেলের ইতিহাস কোথায় জানা যাবে বলতে পারেন? ভদ্রমহিলা বলেন, ইতিহাস জানি না, তবে এটাই ব্যাংককের অন্যতম প্রাচীন হোটেল। একসময় রাজা-রাজড়ার পায়ের ধুলো পড়ত হরদম, সেরকমই শুনেছি। আমি জানতে চাই, আচ্ছা আপনাদের কোনও প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট রয়েছে? থাকলে একবার দেখা যায়? ভদ্রমহিলা বলেন, আগে ছিল, এখন ব্যাবসা টিকিয়ে রাখতে সব সাধারণ ঘর। তবে আপনি এতকিছু জানতে চাইছেন কেন? থাকবেন নাকি? এখন লো সিজ়ন চলছে, সিঙ্গল রুম চার হাজার টাকায় করে দেব, সঙ্গে ব্রেকফাস্ট ফ্রি। আমি বুঝতে পারি রয়্যাল হোটেলের রাজকীয় দিন সত্যিই আর নেই। তবু এই চার হাজার টাকাও আমার পাঁচদিনের পাথেয়। তাই হোটেলের লবি থেকে দোতলায় উঠে যাওয়া বিশাল ঘোরানো সিঁড়িটা দেখেই আশ মিটিয়ে নিই। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে একবার সত্যিই মনে হয়, এই বুঝি আজাদ হিন্দের সেনানায়কের পোশাকে নেমে আসবেন নেতাজি। গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে পাশে থাকবেন দেবনাথ দাস কিংবা সত্যানন্দ পুরী। আজকের এই লবি ভরতি লোক সসম্মানে সরে দাঁড়াবে। নেতাজি একবার একটু দাঁড়াবেন, সবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসবেন। তারপর দ্রুত হেঁটে উঠে পড়বেন তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ গাড়িতে।

স্বপ্নবিচরণ ছেড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসি। রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ধরি সিলোপাকর্ন বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পথ। একে রবিবার, তাঁর ওপর চিনা নববর্ষ। টুরিস্ট উপচে পড়ছিল রাজবাড়ির রাস্তায়। দলে দলে টুরিস্ট তাঁদের দলের পান্ডার পিছুপিছু চলেছেন, ঠিক যেন একপাল ছাগল। পান্ডা একটা পতাকা উঁচিয়ে পথ চলছে। এক একটা দলের এক একরকম পতাকা। যে যার নিজের কালার কোড মনে রেখে বজায় রাখছে টুরিস্ট গড্ডলিকার এই প্রবাহ। আমাদের দেশে কুম্ভ কিংবা গঙ্গাসাগরের মেলায় এই দৃশ্য দেখা যায় ফি-বছর। এই স্রোতের মাঝখান দিয়ে একরকম সাঁতার কেটে পৌঁছে যাই সিলোপাকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়। দরজা দিয়ে ঢুকতেই একেবারে সামনে সেই অডিটোরিয়াম। একজন কর্মচারীকে প্রশ্ন করতেই জানতে পারি এইটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবথেকে পুরনো সভাঘর। এই সভাঘরের সামনে আমার একটা ছবি তুলে দেবেন? অনুরোধ করি সেই কর্মচারীকে।

হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা নিয়ে সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছিল, ১৫ জুন ১৯৪২-এর কথা। সেইদিন এই সভাঘরেই এক বিরাট মিটিং ডাকা হয়েছিল প্রবাসী ভারতীয়দের। মূলত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ এবং তাই-ভারত কালচারাল লজের উদ্যোগে সংগঠিত এই মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করেছিলেন রাসবিহারী বোস। এই মিটিংয়েই ঠিক হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র বসুকে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে আন্দোলনের নেতৃত্ব। মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্র বসুকে ডেকে আনার জন্য জাপান এবং জার্মান সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাসবিহারী বোসকে। এই মিটিংই পরে বিখ্যাত হয় ব্যাংকক কনফারেন্স নামে। ছবি তুলে ব্যাগে পতাকা রাখতে না রাখতেই ফোন বেজে ওঠে। অজানা নম্বর, অজানা কণ্ঠস্বর। পরিষ্কার হিন্দিতে এক বয়স্ক মানুষের গলা। জয় হিন্দ, আমি বালক সেনা তিলকরাজ পাওয়া বলছি। রত্না ম্যাডাম বললেন আপনি আমার সঙ্গে

দেখা করতে চান। আমার অফিসে আসতে পারবেন এখনি? পারব মানে? আমি প্রস্তুত, বলুন কোথায়, কীভাবে যাব? তাই-ভারতে চলে আসুন, আমি একজনকে পাঠাচ্ছি, আপনাকে তুলে আনবে।

৩

বালক সেনা পাওয়া সাহেবের ফোন পেয়েই দ্রুত হাঁটা শুরু করি তাই-ভারত কালচারাল লজের উদ্দেশে। রত্নাদি বসেই ছিলেন। পাওয়া সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে শুনে খুশি হলেন। বললেন, ইনি খুবই ভদ্রলোক। যান, দেখা করে আসুন। লাইব্রেরির দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই একটা স্কুটি নিয়ে এক বয়স্ক সর্দারজি হাজির। আমি সামনে যেতেই বললেন, আপ হি কো চাচাজিসে মিলনা হ্যায় জি? আমি ঘাড় নাড়তেই আমার হাতে হেলমেট ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, চলিয়ে জি। স্কুটির পিছনে বসতেই কী একটা যেন ঘটে গেল। এক মিনিট আগেই যে সর্দারজিকে এক ধীর, স্থির, বয়স্ক মানুষ মনে হয়েছিল, হেলমেট পরে স্কুটিতে স্টার্ট দেবার পর ভোল সম্পূর্ণ বদলে গেল। কখনও দুটো ট্রাকের মাঝখান দিয়ে সাঁৎ করে, কখনও ধীরে চলা গাড়ির ড্রাইভারকে তাই ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে, কখনও ফুটপাথের ওপর দিয়ে সর্দারজির স্কুটি উড়তে লাগল। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু জ্যাম যখন কিছুতেই কাটছে না তখন সর্দারজি যেটা করলেন তার সমকক্ষ দৃশ্য আমি একমাত্র হলিউডের অ্যাকশন ছবি *ব্লাড স্পোর্ট* কিংবা *মিশন ইমপসিবল*-এ দেখেছি। ব্যাংককের গলির ঠিকুজিকুষ্ঠি আঁকতে গেলে ঘনাদার তস্য তস্য মনে পড়ে যাবে। সেইরকম এক তস্য তস্য গলিতে, যার মধ্যে মানুষ এবং জিনিসপত্র ঠাসা এবং প্রতিটি বস্তুই চলনশীল; হঠাৎ ধ্যাত্তেরির তাই প্রতিশব্দ উচ্চারণ করে, সর্দারজি ভ্রুম করে স্কুটি ঢুকিয়ে দিলেন। আমি যা থাকে কপালে ভেবে সিঁটিয়ে বসলাম। তারপর একটা সরু খালের ওপর পাতা একটা কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে হুস করে পেরিয়ে একটা দোকানের সামনে থেমে বললেন, লো জি, আ গয়া। শর্টকাট লেনা পড়া। আপকো জলদি থা না? জলদি আমার দোকানে পৌঁছনোর ছিল, না সর্দারজির আমাকে সঙ্গে নিয়ে উপরে যাবার, তা নিয়ে আলোচনার কোনও মানে হয় না বুঝেই বলি, বহোৎ ধন্যবাদ আপকো। ওয়াপসি মে ম্যায় খুদ চলা জাউঙ্গা। মনে মনে বলি, এই ন্যাড়াকে হেলমেট পরালেও দ্বিতীয়বার সে ওই স্কুটির পিছনে বসছে না।

দোকানে ঢুকতেই দোতলা থেকে ডাক এল, আইয়ে জি, উপর চলে আইয়ে। রাস্তে মে আপকো কোই দিক্কত তো নেহি হুই? দিক্কতের দিক না মাড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন করি, আপনি নেতাজিকে কোনওদিন দেখেছিলেন? একমাথা রুপোলি চুল ঝাঁকিয়ে তিলকরাজ পাওয়া জবাব দেন, দেখেছি মানে? দু'-দু'বার আমাদের স্কুলের ডর্মিটরিতে রাত কাটিয়ে গেছেন নেতাজি। আমাদের পাশে একই রকম বিছানায় শুয়েছেন। আমরা উনিশজন বালক সেনা ছিলাম এই ব্যাংককের ক্যাম্পে, আর আমাদের শিক্ষক ছিলেন মাস্টার কার্নৈইল সিং। এখন কেবল রাজকুমার সচদেব আর আমি বেঁচে আছি। বলেই একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান তিলকরাজ। হঠাৎ বলতে শুরু করেন এক কবিতা। কবিতা শেষ হলে বুঝি নেতাজিকে নিয়ে লেখা এ তাঁর স্বরচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। বালক সেনা হিসেবে আপনাদের কাজ কী ছিল, এই প্রশ্নের জবাবে তিলকরাজ বলেন, সকালে উঠে ব্যায়াম, দেশের গান। তারপর পড়াশুনা, বিকেলে লাঠি খেলা। আমরা তো আর যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারিনি! তারপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, নেতাজিও চলে গেলেন। আমরা আবার পরাধীন হয়ে গেলাম। তাই

বলে আমরা চুপ করে বসে থাকিনি। ইংরেজ সেনা দেখলেই দূর থেকে জয় হিন্দ বলে আমরা পালাতাম। রাতের অন্ধকারে ওদের ক্যাম্পের দেওয়ালে লিখে দিয়ে আসতাম— জয় হিন্দ। আর ইংরেজ সেনা তো নামেই, আসলে তো ওরা সবাই ছিল ভারতীয়। তবে কি জানো, ইংরেজ সরকার ওদের মগজ ধোলাই করেছিল এই বলে যে কিছু ভারতীয় সেনা বেইমানি করেছে, জাপানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদেরকে শায়েস্তা করতেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। কিন্তু বর্মা ঢোকার পর ওরা যখন দেখেছিল হাজারে হাজারে প্রবাসী ভারতবাসী নেতাজির সেনাদলে, তখন ওরা অনেকটাই নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। এরকম অনেকবার ঘটেছে যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির সেনারা আমাদের খাবারের প্যাকেট দিয়েছে। ওদের সাদা চামড়ার অফিসার কৈফিয়ত চাইলে বলেছে, এরা আমার নিজের দেশের লোক। তবে এটাও ঠিক যে বহু ভারতীয়ই সেসময় খুব মন দিয়ে ইংরেজের জুতোর সুকতলা চেটেছে। যুদ্ধ চলাকালীন আজাদ হিন্দ ফৌজেরই বেশ কিছু অফিসার ব্রিটিশ পক্ষে গিয়ে হাত মিলিয়ে আমাদের সব খবর ফাঁস করে দিয়েছিল। দেখলাম, এই কথা বলতে গিয়ে আমার সামনে বসা এক বৃদ্ধ বালক সেনা আজও কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। বুঝলাম, নেতাজির স্পিরিট এখনও একই রকম আছে।

আজ তা হলে উঠি, বলে বেরিয়ে আসছিলাম। পাওয়াজি বললেন, জানো, ব্যাংককে যুদ্ধ শেষ হবার অনেকদিন পরেও আজাদ হিন্দ টাঙ্গা অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ি চলত? তাই এবং ভারতীয়, সবার জন্য ফ্রি ছিল এই টাঙ্গা। কাউকে ভাড়া দিতে হত না। অনেকটা আজকের ফ্রি সিটি বাসের মতো। এও ছিল নেতাজির এক দূরদর্শিতার প্রমাণ। নেতাজি জানতেন, যুদ্ধের পর ভারতীয়দের সংকটে পড়তে হবে, হাতে টাকাকড়ি থাকবে না; তাই এই ব্যবস্থা। পাওয়া সাহেবকে বিদায় জানিয়ে সেই ঘিঞ্জি গলি ধরে হাঁটতে থাকি। আমার মনে পড়ে, জাপান সারেন্ডারের পর শেষবার যখন ব্যাংককে এসেছিলেন নেতাজি, তখন দেবনাথ দাস তাঁকে বলেছিলেন তাইল্যান্ডের কোনও এক বৌদ্ধ গুম্ফায় তাঁকে লুকিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। কিন্তু নেতাজি দেবনাথ দাসের কথা শোনেননি।

৪

ব্যাংকক শহরের রাস্তাগুলোর মধ্যে এক জ্যামিতিক সারল্য আছে। সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এখানে জনপদ গড়ে ওঠার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। তবে আক্ষরিক অর্থেই এক রাম রাজত্বে (রাজা চতুর্থ রাম, ১৮৫১-৬৮) আধুনিক ব্যাংককের গোড়াপত্তন হয়। পাতা হয় রেলপথ, তৈরি হয় পাকা সড়ক, বসে ছাপাখানা, বন্ধ হয় ক্রীতদাস প্রথা। ১৯২৭-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিঙ্গাপুর থেকে মালয় হয়ে রেলপথে এসেছিলেন ব্যাংকক। মহারাজ প্রজাধিপক তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজসভায়। কবি পাঠ করেছিলেন: I come, a pilgrim, at thy gate, O Siam,/ to offer my verse to the endless glory of India. অবশ্য রাজ-অনুগ্রহ ছাড়াও, প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কবিকে ব্যাংককে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন গুজরাতি মুসলিম ব্যবসায়ী জনৈক এ ই নানা। আজকের ব্যাংককের নাইটলাইফের কেন্দ্র সুকুমভিতে দুটো রাস্তা রয়েছে এই নানাসাহেবের নামে। আসলে তৎকালীন প্রাচ্যের শিক্ষিতসমাজে এবং নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব পড়েছিল। এরই এক প্রকাশ ছিল তাই-ভারত কালচারাল লজ এবং সত্যানন্দ পুরী। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য, হালের ভারত-চিন সামিট (মোদী-শি উহান সামিট, ২০১৮)-এর প্রাক্কালে চিনের পিপলস্ লিবারেশন আর্মিও রবীন্দ্রনাথের কোটেশন ব্যবহার করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে কবির বিশ্বজনীনতা এবং প্রাসঙ্গিকতা আজও রয়েছে। আধুনিক ভারতের সরকার বাহাদুর অবশ্য *বেদ*-পুরাণ আঁকড়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে করেন। অবশ্য তা না হলে বিজ্ঞান কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পুষ্পক রথ আর গণেশের প্লাস্টিক সার্জারির গল্প শোনাবেন কী করে?

রত্নাদি বলে রেখেছিলেন পরদিন তাই-ভারতের একজন কমিটি মেম্বারের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবেন। সঙ্গে এও বলেছিলেন যে, বিশেষ কাজের কাজ হবে না তবু একবার দেখা করলে ক্ষতি নেই। আমিও সময়মতো হাজির হয়েছিলাম সেই লাইব্রেরি ঘরে। ঢুকেই দেখি দুই বয়স্ক মানুষ আমার অপেক্ষায়। আমি ঘরে ঢুকতেই একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নমস্কার, আমার নাম রাজ মাটা। আমি বর্তমানে এই সংঘের জনসংযোগ দেখি। আমার দাদা কিসনলাল মাটা ছিলেন একজন বালক সেনা। আমি বলি, ওঁর ছবি আমি দেখেছি এবং গতকালই শ্রীতিলকরাজ পাওয়া আমাকে তাঁর কথা বলেছেন। রাজ মাটা বলেন, নেতাজি এবং যুদ্ধের সময় সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না। আজ দাদা বেঁচে থাকলে আপনি অনেক কিছু পেতেন। নেতাজি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে আপনি এই বইগুলি পড়ে দেখতে পারেন। বেশ কিছু বই পড়েই পথে নেমেছি একথা বোঝাতে একটু সময় লেগে যায়। বলি, তাই-ভারত কালচারাল লজে এসে নেতাজি, সত্যানন্দ পুরী কিংবা দেবনাথ দাস সম্পর্কে কিছুই পাব না, এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে। রাজ মাটা বলেন, আসলে এই বাড়িতে আমরা হালে এসেছি। বাড়ি বদলের সময় অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে এই বইটা কি আপনার পড়া? বলে একটি বই আমার দিকে এগিয়ে দেন। আমি দেখি বইটি দর্শন সিং বাজাজের লেখা *দি আননোন ট্রুথ* । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাইল্যান্ডের ভূমিকা সংক্রান্ত বইটি সত্যিই আমার পড়া ছিল না। ভারতে এই বই দেখিনি এবং নেতাজি গবেষণায় এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। এই কথা বলতেই রাজ মাটা বলেন, এটি আমাদের তরফ থেকে আপনাকে উপহার। কৃতজ্ঞ মনে বই হাতে নিতে না নিতেই রাজ মাটা আমার দিকে একটি ছোট খাম এগিয়ে দেন। খাম খুলে দেখি, ব্যাংককের বালক সেনাদের একটি দুর্লভ গ্রুপ ছবি। বলা বাহুল্য, এই ছবি ছিল আমার কাছে এক দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য প্রাপ্তি। রাজ মাটা সাহেব এবং রত্নাদির কাছে এই জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম।

কথোপকথন শেষ হতেই উঠব উঠব করছি, এমন সময় রাজ মাটার পাশে বসা ভদ্রলোক এই প্রথম মুখ খুললেন। বললেন, এখন কোথায় যাবেন? যদি সময় থাকে তো আমাদের সঙ্গে একবার মন্দিরে চলুন। দুপুরে আরতির পর প্রসাদও খেতে পারবেন। বিনা পয়সায় খাবার পাওয়া যাবার সম্ভাবনা একেবারেই হাতছাড়া করা উচিত নয় ভবঘুরের, তাই হ্যাঁ বলে দিলাম। মন্দিরের সামনে পৌঁছে দেখি এলাহি ব্যাপারস্যাপার। হিন্দু মহাসভা নামের এক সংগঠনের এই মন্দির এবং সংলগ্ন স্কুল। বাড়ির দোতলায় এক হলঘরে মন্দির, সিসি টিভিতে দেখা যাচ্ছে আরতি, বোসের স্পিকারে শোনা যাচ্ছে হেঁড়ে গলায় বেসুরো ভজন এবং মন্ত্রপাঠ। আরতি শেষে একেবারেই উত্তরভারতীয় কায়দায় গঙ্গা মাইয়া এবং গোমাতার জয় দিয়ে সবাই গোগ্রাসে প্রসাদ খেতে বসল। পুরি, তরকারি এবং হালুয়া খাবার পর বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই রাজ মাটার পার্ষদ ভদ্রলোক আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কলকাতার লোক, তাই না? হ্যাঁ বলতেই সরাসরি রাজনীতিতে চলে গেলেন। বললেন, আপনাদের পশ্চিম বাঙ্গাল তো পুরো পাকিস্তান হয়ে গেছে।

উত্তর একটা দিতেই হত। তাই বলি, আমি তো পশ্চিমবঙ্গেই থাকি, ওখানেই জন্ম-কর্ম। আমার মনে হয় না আপনার কথা ঠিক। আপনি কি কলকাতা গেছেন কখনও? পালটা প্রশ্ন করতে বাধ্য হই। রাজ মাটা একটু অস্বস্তি বোধ করলেও ভদ্রলোক বলে চলেন, যাবার কী প্রয়োজন? সবই তো ফেসবুক আর টিভিতে আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। আর আমাদের সংঘের লোকজনও ভারত থেকে আসা-যাওয়া করেন নিয়মিত। সংঘ বলতে যে সেটা আরএসএস তা ততক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি বুঝলাম রত্নাদির কথা একদম ঠিক। এই গোমাতার সন্তানেরা ভারতীয় সংস্কৃতির সার বলতে গোবর বোঝেন।

৫

ব্যাংককের হিন্দু মহাসভার মন্দির থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েই। মনে পড়ছিল ব্যাংকক কনফারেন্সের অন্যতম উদ্যোক্তা দেবনাথ দাসের কথা। ব্যাংকক কনফারেন্সের সাফল্যের পিছনে দেবনাথ দাসের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল। ন'দিন ধরে চলা এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন জাপান, জার্মানি এবং ইতালির রাষ্ট্রদূতেরা। অধিবেশনে তাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল পিবুল সংগ্রাম তাঁর বার্তায় বলেছিলেন, তাইল্যান্ডের মানুষ স্বাধীনতার মর্যাদা বোঝে। তাই ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তাইল্যান্ডের রয়েছে পূর্ণ সহানুভূতি। ভারতবর্ষ থেকে আমরা শিল্পকলা আর বিজ্ঞান শিখেছি, আর পেয়েছি আমাদের বৌদ্ধধর্ম। আমাদের ধর্ম, ভাষা, শিল্প, বিজ্ঞান— সবকিছুর মাতৃভূমি হল ভারত। জার্মানি থেকে নেতাজি স্বয়ং পাঠিয়েছিলেন তাঁর বার্তা। নেতাজি লিখেছিলেন, ব্রিটিশরা তো পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে বিদেশি সৈন্য, বিদেশি অস্ত্র এনে ভারত ছেয়ে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর বিদেশি সাহায্য নেবার অধিকার থাকবে না কেন? তবে অনেক উদ্দীপনার মধ্যেও এক শোকের ছায়া ঢেকে রেখেছিল অধিবেশনকে। মাস দুয়েক আগেই, এই ব্যাংকক কনফারেন্স নিয়ে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে আলোচনা করতে টোকিও যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন সত্যানন্দ পুরী, প্রীতম সিং, আক্রম খান এবং এন নায়ার। প্রীতম সিং-এর মৃত্যুতে প্রবল ক্ষতি হয়েছিল আন্দোলন সংগঠনে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল সেই গুরুদোয়ারা খুঁজে বার করা দরকার যেখানে জাপানি ইন্টেলিজেন্স অফিসার ফুজিওয়ারা প্রথমবার গোপনে যোগাযোগ করেছিলেন প্রীতম সিং-এর সঙ্গে।

ফুজিওয়ারা নিজে কৃষ্ণ বসুকে বলেছিলেন, যেদিন প্রীতম সিং-এর সঙ্গে প্রথম দেখা করতে যাব, আমার মধ্যে ছিল প্রেয়সীর সঙ্গে মধ্যরাতে দেখা করতে যাবার উত্তেজনা। দেখা অবশ্য দিনের বেলাতেই হয়েছিল। প্রীতম সিং ফুজিওয়ারাকে বলেছিলেন, কেমন করে ব্রিটিশের চোখ এড়িয়ে উনি ব্যাংকক এসে পৌঁছেছিলেন এবং বলেছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের কথা। হস্টেলে ফিরে কিছুক্ষণ ইন্টারনেট এবং দর্শন সিং বাজাজের বই ঘাঁটতেই বুঝতে পেরেছিলাম, আমার কাঙ্ক্ষিত সেই গুরুদোয়ারা খুব দূরে নয়। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিলাম চক্রপেট রোডের উদ্দেশে। খুঁজে পেতে একদমই অসুবিধে হয়নি। গুরুদোয়ারা শ্রীগুরু সিং সভার ভিতরে পা রাখতেই একজন মাথায় বাঁধার রুমাল এগিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভজন হচ্ছে চারতলায়, চলে যান। চারতলার বিশাল হলঘরেই *গ্রন্থসাহিব*-এর পাশে বসেছিলেন গ্রন্থী এবং হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিলেন রাগীরা। এক অদ্ভুত নরম এবং দয়ালু সুরে ঘর ভরে ছিল। সকালের তিক্ততা মুছে

গিয়ে মন আবার আশায় ভরে উঠেছিল। কেন জানি না, আমার অনেকবারই মনে হয়েছে, শিখদের কাছে পৃথিবীর বাকি ধর্মাবলম্বীদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। সবার উপরে মানুষ সত্য— এই কথা, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার কাজে পরিণত করে দেখিয়েছে শিখ সম্প্রদায়।

পরদিন আরও একবার তাই-ভারত কালচারাল লজে গিয়েছিলাম রত্নাদিকে বিদায় জানাতে। যেতেই রত্নাদি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ড. চিরাপত প্রপন্দবিদ্যার সঙ্গে। সংস্কৃত ভাষার এই মহাপণ্ডিত বর্তমানে তাই-ভারতের উপ-সভাপতি। ড. চিরাপতকে ঘিরে তাঁর কিছু ছাত্রছাত্রীও উপস্থিত ছিল। রত্নাদি আমার পরিচয় করিয়ে দিতে কিছুক্ষণ নেতাজির আলোচনায় সময় কেটেছিল। উনি বলেছিলেন, কেবল সিলোপাকর্ন নয়, চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও নেতাজি একাধিকবার বক্তৃতা করেছিলেন। কথায় কথায় জানতে চেয়েছিলাম দর্শন সিং বাজাজের কথা। অধ্যাপক উত্তর দিয়েছিলেন, জাপানি সেনা তাইল্যান্ডে ঢুকছে এই খবর পেয়ে বহু ভারতীয় বর্মা হয়ে ভারতের পথে রওনা হয়েছিল। দর্শন সিং পালাননি, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আন্দোলন সংগঠনে। আলাপ হয়েছিল দেবনাথ দাসের সঙ্গে, জড়িয়ে পড়েছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল এবং তাই-ভারতের কর্মকাণ্ডে। ওঁর কাছেই আমরা শুনেছিলাম ব্যাংকক কনফারেন্সে জাপানি জেনারেল ইওয়াগুরো কীভাবে নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব খারিজ করে দিতে চেয়েছিলেন। যদি আর তিন দশক আগে আপনি আসতেন তা হলে দেখতে পেতেন এই তাই-ভারতের অফিসেই উনি বসে আছেন। পাশে হয়তো বসে আছেন বালক-সেনা রামলাল সচদেভ। চুপ করে বসে থাকলে শুনতে পেতেন দু'জনের গভীর আলোচনা — কীভাবে তাইল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও মজবুত করা যায়, কীভাবে নতুন এক স্কুল বানানো যায় মিয়ানমারের উদ্বাস্তুদের জন্য— এই সব। ভারতের স্বাধীনতা যে ভিক্ষা স্বরূপ আসেনি একথা বারবার বলতেন। আরও বলতেন, স্বাধীনতা পেলেই সব শেষ হয়ে যায় না। দেশ গড়ার কাজ চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। ওঁদের পাশে বসে কথোপকথন শুনে মনে হত যেন এই সেদিন ভারত স্বাধীন হয়েছে। বারবার বলতেন রবীন্দ্রনাথ আর নেতাজির কথা। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৮ তাই-ভারতের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন দর্শন সিং বাজাজ।

রত্নাদি বলেছিলেন, ক'দিন পরেই ড. প্রপন্দবিদ্যা দিল্লি যাচ্ছেন, রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার নিতে। রত্নাদি এবং অধ্যাপককে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় বেরতেই আমার তাইল্যান্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

মিয়ানমার পর্ব

১

ব্যাংককে থাকতেই ইয়াঙ্গনের ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করে জেনেছিলাম কাঞ্চনাবুড়ি হয়ে যে-পথ ফুনারন হয়ে মিয়ানমারের তি-কি সীমান্ত পোস্টে ঢুকেছে, সে-পথে ভারতীয়দের প্রবেশ সম্ভব নয়। মণিপুর থেকে রিট্রিটের সময় এই পথেই আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং রানি ঝাঁসি ব্রিগেড তাইল্যান্ড ফিরেছিল। নেতাজি নিজে বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। ভারতবর্ষের জন্য সেদিনের তাইল্যান্ডের সমস্ত প্রবেশপথ ছিল সর্বদা উন্মুক্ত। আজ পরিস্থিতি পরিবর্তিত, তাই পরদিন সাতসকালে নিরুপায় হয়ে ধরেছিলাম মায়ে-সত যাবার বাস। মায়ে-সত তাইল্যান্ড এবং মিয়ানমারের অন্য একটি ল্যান্ড বর্ডার। সালউইন নদীর একটি উপনদী মোয়েই এখানে প্রাকৃতিক সীমারেখার কাজ করে চলেছে। ব্যাংকক থেকে ঘন্টা দশেক বাসে বসে থাকার পর যখন মায়ে-সত পৌঁছলাম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধের মুখে। সন্ধেবেলা সীমান্ত পার হব না ঠিক করেই রেখেছিলাম। সীমান্তের চেকপোস্ট লাগোয়া একটা হোটেলে ব্যাগ রেখে হাঁটতে গিয়েছিলাম মোয়েই নদীর ধারে। গিয়ে দেখি নামেই নদী, আদতে একটা মজা খাল। চেকপোস্টের নাকের ডগায় অবাধে চলছে অবৈধ নদী পারাপার। পড়েছিলাম, ১৯৪২-এ দুই ভারতীয় ব্যবসায়ীর হাত দিয়ে এই মায়ে-সত সীমান্ত দিয়েই নেতাজির লেখা একটি গোপন চিঠি দেবনাথ দাস এবং দর্শন সিং বাজাজ পাঠিয়েছিলেন কলকাতার গুপ্ত সমিতির উদ্দেশে। ব্যাংকক থেকেই জনৈক মি. শর্মা এই দুই ব্যবসায়ীর সঙ্গে জুটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন— তিনিও কলকাতা যাবেন। রেঙ্গুনে যুদ্ধের বাজারে জাহাজের টিকিটের হাহাকার ছিল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মি. শর্মা অনায়াসে জোগাড় করে দিয়েছিলেন কলকাতার জাহাজের টিকিট। কলকাতা পৌঁছতেই ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল দুই ব্যবসায়ীকে। চিঠি অবশ্য পুলিশের হাতে পড়েনি। পরে জানা গিয়েছিল, এই মি. শর্মা ছিলেন ব্রিটিশের গুপ্তচর। ব্যাংককে দর্শন সিং এবং দেবনাথ দাসের ওপর নজর রাখাই ছিল তাঁর কাজ। পঞ্চাশের দশকে দিল্লি গিয়ে দর্শন সিং জানতে পেরেছিলেন সেই মি. শর্মা তখন পঞ্জাব পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার। সেদিনের দেশদ্রোহী স্বাধীনতার পর পেয়েছিলেন উচ্চ সরকারি পদ আর আজাদ হিন্দের সেনানীদের পেনশন তো দূরের কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকৃতিও জোটেনি!!

পরদিন সকালে উঠেই পিঠে স্যাক তুলে হাঁটা শুরু করেছিলাম। তাইল্যান্ডের এক্সিট স্ট্যাম্প পাসপোর্টে লাগিয়ে হেঁটে পার হয়েছিলাম তাই-মিয়ানমার ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ। লক্ষণীয়ভাবে, যতই মিয়ানমারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, রাস্তার ওপর পড়ে থাকা আবর্জনা বাড়ছিল, পথের দু'ধারে বসেছিল ভিখারি, পথচারীরা যেখানে-সেখানে থুথু ফেলছিল। আসলে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, তাইল্যান্ড— তিনটে পরিচ্ছন্ন এবং নিয়মানুগ দেশের পর মিয়ানমারের অপরিচ্ছন্নতা এবং বিশৃঙ্খলা ভারতবর্ষের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ভাবছিলাম, একটা খালের এপার-ওপারে মানুষের আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাত্রায় এত পার্থক্য হয় কী করে? তাইল্যান্ড

এবং মিয়ানমার— দুটিই গোঁড়া বৌদ্ধ দেশ, কাজেই ধর্মের দোহাই এখানে প্রযোজ্য নয়। ভাবতে ভাবতেই এসে পড়েছিলাম মিয়ানমারের ইমিগ্রেশন অফিসে। ইমিগ্রেশন লেখা একটা ছোট ঘরে ঢুকতেই মনে হয়েছিল যেন সত্তরের দশকে ফেরত চলে গিয়েছি। রেডিয়োতেই একটা গান চলছিল, তার সঙ্গে সংগত করছিল একটা টেবিল ফ্যান। ভাঙাচোরা, নড়বড়ে কাঠের টেবিলের দুই প্রান্তে বসেছিলেন দুই অফিসার। আমি ঢুকতেই দু'জনের একজন মুখে পানের পিক সামলে, রাঙা ঠোঁট সাবধানে ফাঁক করে বলেছিলেন, মিংলাবা— ওয়েলকাম টু মিয়ানমার।

ইমিগ্রেশনের কাজ হয়ে যেতেই ঢুকে পড়েছিলাম মিয়ানমার। সীমান্তের এই শহরের নাম মিয়াওয়াডি। শহরের রাস্তায় পা রাখতেই কয়েকজন গাড়ির ড্রাইভার এবং দালাল গোছের লোক ছেঁকে ধরেছিল। মিয়াওয়াডি থেকে সাধারণত ইয়াঙ্গন যাবার গাড়ির সংখ্যা বেশি। আমি মওলামাইন যাব শুনে ভিড় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় একটা গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। দেখি তিনজন যাত্রী ভিতরে বসে। বুঝতে পারি, আর একজন হলেই গাড়ি ছেড়ে দেবে। আমি মওলামাইন বলতেই ড্রাইভার এবং যাত্রী— দু'পক্ষের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। শেয়ার ট্যাক্সি পেয়ে খুশি হই আমিও। ড্রাইভার ভদ্রলোক সজ্জন। একবর্ণ ইংরেজি বোঝেন না, তবু সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। ওঁর সাহায্যেই আমার পকেটের তাই বাট বদলে কিছু কিয়াট জোগাড় হয়ে যায়। মুহূর্তে লক্ষপতি বনে যাই। গুগল বলে দেয় ভারতীয় পাঁচ হাজার টাকা মিয়ানমারের এক লক্ষ কিয়াট! তবে এই ফুর্তি বেশিক্ষণ টেকে না। ড্রাইভার বলেন মওলামাইন পর্যন্ত ভাড়া মাত্র দশ হাজার চিয়াট। দুটি জিনিস সেই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। এক, মিয়ানমারের লক্ষ টাকা লক্ষণীয়ভাবে মূল্যহীন। দুই, এদেশে ইংরেজি 'k' অক্ষরের পর 'y' থাকলে তা 'ক' নয়, 'চ' উচ্চারণ হয়। ঘণ্টা তিনেক পর পৌঁছে যাই মওলামাইন। বাসস্ট্যান্ডের ধারেই একটা হস্টেলে জায়গাও জুটে যায়।

২

মওলামাইনে আমার ঠিকানা ছিল দি ওল্ড মুলমিন হস্টেল। বিশ্ব জুড়ে ব্রিটিশ যেখানেই তাদের উপনিবেশ গড়েছিল সেখানেই গঙ্গার গঞ্জীকরণ ঘটেছিল; অর্থাৎ মূল নামের পিণ্ডদানপূর্বক এক দো-আঁশলা নামের জন্ম হয়েছিল। ভারতীয়দের এই কথা বোঝার জন্য কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবার কথা নয়। প্রথম অ্যাংলো-বার্মিজ যুদ্ধের (১৮২৬) পরই এই শহর ব্রিটিশের অধীনে চলে আসে এবং পরিচিত হয় মুলমিন নামে। ১৮৫২ পর্যন্ত এই শহর থেকেই একটা দীর্ঘ সময় তারা বর্মা মুলুক শাসন করেছিল। শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* উপন্যাসেও মুলমিনের নাম শোনা যায়। শরৎবাবু অবশ্য 'মৌলমিন' লিখেছিলেন। মনে আছে সেই মেয়েটির কথা? যে অপূর্বকে বলেছিল, 'মাত্র কাল বৈকালে আমরা মৌলমিন থেকে আসিয়াছি।' আশির দশকে, মিলিটারি অভ্যুত্থানের পরে দেশ জুড়ে সমস্ত গ্রাম এবং শহরের প্রাচীন নাম ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। বর্মা হয়েছিল মিয়ানমার, রেঙ্গুন ইয়াঙ্গন, এবং মুলমিন মওলামাইন।

হস্টেলে ঢুকতেই এক সপ্রতিভ তরুণী, নিখুঁত ইংরেজিতে আমায় স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার নাম মোয়ে মোয়ে, তবে আপনি চাইলে জেসিকাও বলতে পারেন। রিসেপশন ডেস্কের পাশেই শোভা

পাচ্ছিল মিয়ানমারের বর্তমান দেশনেত্রী আউং সান সু চি-র একটি সুন্দর ছবি। কেন জানি না আমি আমার হোস্ট এবং আউং সানের মুখের আদলে আর হাসির মধ্যে এক অদ্ভুত মিল দেখতে পেয়েছিলাম। অনুমতি নিয়ে ছবি তোলার সময় মোয়ে মোয়ে বলেছিলেন, জানেন তো আজ আমাদের দেশনেত্রী দ সু চি-র জন্মদিন। পরের কয়েক ঘণ্টায় এক সুন্দর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল আমাদের। জানতে পেরেছিলাম, 'দ' (DAW) শব্দটা আসলে সম্মানসূচক, অনেকটা ইংরেজি 'লেডি'-র মতো। মোয়ে মোয়ে-কে আমি বলেছিলাম, গুম্ফা-প্যাগোডা দেখতে আমি এখানে আসিনি, এসেছি ইতিহাসের খোঁজে। সংক্ষেপে নেতাজি এবং আমার বর্তমান প্রোজেক্টের কথা জানিয়ে বলেছিলাম, আপনাদের আজকের দেশনেত্রীর বাবা জেনারেল আউং সান ছিলেন নেতাজির অত্যন্ত গুণগ্রাহী। মওলামাইনে আমি খুঁজছি মূলত দুটো জিনিস— এক, পুরনো রেলস্টেশন এবং দুই, জেলখানা।

আমার কথা শেষ হতেই পাড়ার জনাদুয়েক বয়স্ক মানুষের সঙ্গে আলোচনায় মশগুল হয়েছিলেন মোয়ে মোয়ে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর এক মধ্যবয়স্ক মানুষ আমাকে বলেছিলেন, চলুন আমার সঙ্গে। মোয়ে মোয়ে মুচকি হেসে বলেছিলেন, কোনও চিন্তা নেই, উনি আমার লাকাকা। 'লা' মানে হল চাঁদ। এই যে এখনকার স্টেশন দেখছেন এটা মাত্র বছর পনেরো হল তৈরি হয়েছে। পুরনো স্টেশন একেবারে ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে শহরের অন্য প্রান্তে। আপনি একা গেলে খুঁজে পাবেন না। কাকার সঙ্গে যান। লুঙ্গি পরিহিত লাকাকা বাইক স্টার্ট দিয়ে পানে রাঙা ঠোঁট ফাঁক করে বলেছিলেন, 'কাম।'

পরের দু'ঘণ্টা জুড়ে কাকার মোটরবাইকে বসে মওলামাইন চষে ফেলেছিলাম। পৌঁছে ছিলাম মুপন এলাকার সেই স্টেশনে। স্টেশনের ভগ্নপ্রায় ধ্বংসস্তূপ দেখে কল্পনা করা বেশ কঠিন ছিল ১৯৪৩-এর ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে, এখানেই তাইল্যান্ড সীমান্ত হয়ে এসে পৌঁছেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর ট্রেন। মালয়েশিয়ার তাইপিং থেকে ২৪ নভেম্বর রওয়ানা হয়ে সবার আগে পৌঁছেছিল সুভাষ ব্রিগেড। মওলামাইনে একদিন বিশ্রাম নিয়ে সেই ট্রেন আবার রওনা হয়েছিল রেঙ্গুনের অভিমুখে। ভেঙে পড়া টিকিট ঘর, নিশ্চিহ্নপ্রায় রেললাইন, ভেঙে দুমড়ে থাকা সিগন্যাল পোস্ট— হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছিলাম। ধ্বংসস্তূপ আর পোড়ো বাড়ির প্রতি আমার আগ্রহ দেখে কাকা বলেছিলেন, চলুন আপনাকে তা হলে আরও একটা বাড়ি দেখাই। মিনিট দশেক লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে পৌঁছেছিলাম শহরের একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে। একটা ছোট মাঠের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল প্রাসাদোপম এক দোতলা বাড়ি। কাকা বলেছিলেন, এটা ছিল জাপানি কেম্পেতাই, অর্থাৎ ওদের মিলিটারি পুলিশের সদর দফতর। বাড়িটাকে ছোটবেলা থেকে আমরা 'মিন গি ইয়ন' বলেই জানি। 'মিন গি' শব্দটা জর্জ অরওয়েলের বই *বার্মিজ ডেইজ্*-এ পড়েছিলাম। অরওয়েল পড়ে মনে হয়েছিল 'মিন গি' বিদেশিদের বলা হত। যাই হোক, মিয়ানমারে আমার পা রাখার প্রথম দিনেই, চাঁদকাকার সঙ্গে মওলামাইন ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে দেখেছিলাম নারীপুরুষ নির্বিশেষে, স্থানীয় মানুষ মাত্রেই লুঙ্গি পরেন, মুখ সর্বদা ব্যস্ত থাকে তাম্বুল সেবনে এবং গালে লাগানো হয় থানাখা। থানাখা ব্যাপারটা হিন্দুদের চন্দন ঘষার মতোই, পার্থক্য কেবল প্রয়োগে। হিন্দুদের মধ্যে চন্দনের প্রয়োগ মূলত ধর্মীয়, আর থানাখা হল বর্মিদের প্রাত্যহিক সানস্ক্রিন এবং রূপটান।

বিকেলে গিয়েছিলাম মওলামাইনের জেলখানা দেখতে। এই সেই জেল যেখানে জর্জ অরওয়েল পুলিশের চাকরি পেয়ে এসেছিলেন ১৯২৬-এ। লিখেছিলেন, 'লোয়ার বর্মার মুলমিনে আসার পর আমি এত মানুষের

ঘৃণার পাত্র হয়েছিলাম যে নিজেকে সেই প্রথম একজন কেউকেটা মনে হয়েছিল।' অরওয়েলের লেখায় সেই সময়কার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ স্পষ্ট ছিল।

৩

ব্রিটিশ শাসনকালে রাজদ্রোহীদের ঠিকানা ছিল মওলামাইনের জেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, মওলামাইনের এই জেলই আবার ভরে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়ান এবং মার্কিন যুদ্ধবন্দিতে। জাপানিরা অবশ্য যুদ্ধবন্দিদের এখানে বেশিদিন রাখেনি। অল্প কিছুদিন এখানে রাখার পরেই রেলের ওয়াগন বোঝাই করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আরও দক্ষিণে দাওয়েই-এ এবং ব্যবহার করেছিল কুখ্যাত 'ডেথ রেলওয়ে' তৈরির কাজে। আজ মিয়ানমারের মিলিটারি জুনটা এই জেলকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক বন্দি রাখার কাজে। কাগজে পড়েছিলাম, মিয়ানমারে রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যা এত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে যে সব পুরনো জেলখানাই আকারে এবং প্রকারে বাড়াতে হচ্ছে। আর মওলামাইনে এতই বন্দি বাড়ছে যে সরকার এক নতুন জেলখানা বানানো সাব্যস্ত করেছেন। নতুন জেল হয়ে গেলে এই ঐতিহাসিক জেল ভেঙে একটা পার্ক বানানো হবে— এই পরিকল্পনা। আসলে নতুন মিয়ানমার, কোনটা তাদের রক্ষণীয় ইতিহাস এবং সঠিক ঐতিহ্য, এই বিষয়ে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেনি। এই অবস্থায় একমাত্র পর্যটন ব্যাবসাই পারে মিয়ানমারের কলোনিয়াল হেরিটেজগুলিকে বাঁচাতে।

পড়ন্ত বিকেলে থানলুইন নদীর পাড়ে, স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাঁটার সময় আলাপ হয়েছিল একঝাঁক ছেলেমেয়ের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছিল ছয় দশকের মিলিটারি শাসনের পর গণতন্ত্রের যে মৃদু আভাস এদেশে এসেছে তাতে নতুন প্রজন্ম উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। যে-কোনও আগন্তুককে তারা নিজের দেশের সংস্কৃতি জানাতে ভীষণ আগ্রহী। ওদের পাল্লায় পড়েই আমার মিয়ানমারের স্ট্রিট ফুডের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। একটা ঠেলাগাড়ি ঘিরে প্রবল ভিড়। কাছে যেতেই দেখি নানারকম তেলেভাজা। একটার দিকে আঙুল দেখাতেই দোকানদার বলেছিল 'আলু'। কামড় দিয়ে দেখি সত্যিই নির্ভেজাল আলুর চপ। অর্থাৎ, দেশ এবং ভাষা বদলালেও আলু তার নাম বদলে ফেলেনি। এদিকে আমি আলুর চপ কামড়ে খাচ্ছি দেখে আমার কিশোরবাহিনী হেসেই অস্থির। বলে, এভাবে নয়, আলুর চপ খেতে হয় নুডল স্যুপে ফেলে। সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে চিংড়ি শুঁটকির আচার। তবে না জমবে খাওয়া! ওরকম শুধু শুধু আলুর চপ চিবোনো একেবারেই অর্বাচীনের কাজ। আমিও পত্রপাঠ ওদের কথামতো রাস্তার ধারে বেঞ্চে বসে পড়েছিলাম। মনে মনে ভেবেছিলাম, এইভাবে আলুর চপের সদব্যবহার উত্তর কলকাতার লোকজন দেখলে নির্ঘাত 'গেল গেল' করে উঠবেন।

দু'দিন মওলামাইন থাকার পর সকাল ছ'টার ইয়াঙ্গন যাবার ট্রেন ধরেছিলাম। ধীর গতির মিটার গেজ ট্রেন থানলুইন নদীর ওপর দীর্ঘ সেতু পার হয়ে চলা শুরু করেছিল। খাল, বিল, নদী, নালা পার হয়ে দুলকিচালে ট্রেন চলছিল, আসছিল একের পর এক স্টেশন। চলছিল যাত্রীর ওঠানামা। জানলা জুড়ে ছিল অবিকল আমাদের গ্রামবাংলার ল্যান্ডস্কেপ। খাবারদাবারের বিচিত্র পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অগণিত হকার।

মিয়ানমারের রেল হকারদের লিস্টে ছিল হরেকরকমের শুঁটকি মাছ, টোফু মেশানো স্যালাড, ভুট্টা সেদ্ধ, গান এবং সিনেমার সিডি, চা-কফি এবং শীতল পানীয়। বেলা গড়াতে একজন কলাপাতায় ভাত নিয়ে ফিরি করতে এলে আমি কিনে নিয়েছিলাম। ১০০০ চিয়াট অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকায় পেয়েছিলাম ভাত, আচার এবং একটুকরো চিকেন— মন্দ কী! দশ ঘণ্টার পথ, শরীরটাকে তো রাখতে হবে! মনে হয়েছিল বসে আছি বাংরিপোসির পুরনো সেই রাজার ট্রেনে, আবার কখনও মনে হয়েছিল, এ যেন সেই মোম্বাসা থেকে লেক ভিক্টোরিয়া যাবার ট্রেন— 'আয়রন স্নেক'। গোটা পথে চারবার টিকিট চেকিং হয়েছিল।

বিকেলের দিকে আমাদের ট্রেন সিটং নদীর ব্রিজ পার হয়েছিল। ১৯৪২-এর ২২ ফেব্রুয়ারি, জাপানি আক্রমণ থেকে পিছু হটার সময় এই ব্রিজ ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। তারা চেয়েছিল যে-কোনও মূল্যে জাপানের রেঙ্গুন পৌঁছনো আটকাতে। ব্রিটিশ-১৭ ডিভিশনের এক বিশালসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য আটকে পড়েছিল জাপান অধ্যুষিত নদীর দক্ষিণ পাড়ে। চাইলে সম্পূর্ণ ডিভিশনটাকেই জাপানিরা সেদিন নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারত, কিন্তু তখন তাদের লক্ষ্য ছিল রেঙ্গুন। অবশেষে ৯ মার্চ ১৯৪২, রেঙ্গুন দখল করেছিল জাপানি সেনা। সিটং ব্রিজ পার হবার একটু পরেই এসেছিল ছোট্ট স্টেশন ওয়াও (WAW)। ৩০ সেকেন্ডের জন্য থেমেছিল ট্রেন। আমি ট্রেন থেকে নেমে ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলাম স্টেশন ঘর এবং আশেপাশের। কারণ, এই ওয়াও স্টেশনেই ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ হয়েছিলেন সিপাই জিৎ সিং। মওলামাইন থেকে রেঙ্গুন যাবার পথে এখানেই ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান আক্রমণ করেছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের ট্রেন। ফাইটার প্লেনের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে স্টেশনেই মারা গিয়েছিলেন সৈনিক জিৎ সিং। স্টেশনের পাশেই তাঁর শেষকৃত্য করা হয়েছিল। মনে হচ্ছিল এই ওয়াও স্টেশনে শহিদ জিৎ সিং-এর নামে একটি ফলক থাকলে বড় ভাল হত।

৪

সকাল ছ'টায় মওলামাইন থেকে রওনা হয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ইয়াঙ্গন সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছে মনে হয়েছিল কলকাতায় ফিরে এসেছি। মনে হয়েছিল, এবার লোকাল ট্রেন ধরে বাড়ি গেলেই হয়। আকারে-আয়তনে-ব্যস্ততায় ভারতবর্ষের মাঝারি রেলস্টেশনগুলোর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, ইয়াঙ্গন সেন্ট্রাল স্টেশনের সরল স্থাপত্য এবং আড়ম্বরবিহীন কার্যকারিতা ভাল লেগেছিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে ফুটব্রিজ ধরে উঠে সরাসরি পৌঁছে গিয়েছিলাম পানসোদান রোডের ফ্লাইওভারে। ফুটপাথে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম স্টেশন এবং নিত্যযাত্রীর গতিবিধি। আসলে আমার এই গবেষণামূলক যাত্রায় মিয়ানমারের রেলপথ এবং স্টেশনগুলোর একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কারণ, জানা ছিল ১৯৪৪-এর জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে আমাদের বাহিনী রেলপথে এসে পৌঁছেছিল ইয়াঙ্গন এবং কয়েকদিন বিশ্রামের পর ভারত সীমান্তের দিকে রওনা হয়েছিল। সুভাষ ব্রিগেডের ১ নম্বর ব্যাটালিয়ন প্রোম (বর্তমান নাম পী) হয়ে এগিয়েছিল কালাদান নদীর উপত্যকার দিকে। আর ২ এবং ৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন গিয়েছিল মান্দালয়। এখন প্রশ্ন ছিল একটাই— এই ইয়াঙ্গন সেন্ট্রাল স্টেশনই কি সেই স্টেশন যেখানে বর্মার যুদ্ধের অন্তিম অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল? একটা খটকা থেকেই গিয়েছিল। হিসেব মিলছিল না। কারণ ইতিহাস বলছিল, ১৮৭৭-এ ইয়াঙ্গন সেন্ট্রাল স্টেশন

চালু হলেও, ১৯৪২-এ জাপানিদের তাড়া খেয়ে ভারতের দিকে পালানোর সময় ব্রিটিশরা নিজেরাই এই স্টেশন এবং সংলগ্ন রেললাইন ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই স্টেশন নতুন করে তৈরি শুরু হয়েছিল ১৯৪৮-এ মিয়ানমার স্বাধীন হবার পর এবং ঠিকঠাক ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। তা হলে প্রশ্ন হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের ট্রেন ইয়াঙ্গন শহরের কোন স্টেশনে থেমেছিল?

নেতাজির সেনাপতিরা— শাহনওয়াজ খান, আবিদ হাসান সাফরানি, জন থিভি— এঁরা কেউই তাঁদের বিবরণে স্টেশনের নাম লেখেননি; তার কারণ সম্ভবত তখন ওই একটিই রেলস্টেশন ইয়াঙ্গনে চালু ছিল। একটা নাম আমি অন্যত্র পেয়েছিলাম— ক্যাম্বে (CAMBAY) রেলওয়ে স্টেশন। এও জেনেছিলাম যে, ক্যাম্বে স্টেশনের কাছেই ছিল ফৌজের রিক্রুটমেন্ট সেন্টার, ট্রেনিং ক্যাম্প। কিন্তু সমস্যা হল, আজকের ইয়াঙ্গনে এই ক্যাম্বে জায়গাটা কোথায় তা কেউ বলতে পারছিল না। গুগল তো নয়ই। গত ডিসেম্বর মাসে খবরে দেখেছিলাম, ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীরামনাথ কোভিন্দ ইয়াঙ্গনে কয়েকজন প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সম্মানিত করেছিলেন। অতএব ইয়াঙ্গনে পৌঁছে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি মনে হয়েছিল। মনে আশা ছিল, দূতাবাস নিশ্চয়ই নেতাজি এবং আজাদ হিন্দের স্মৃতিবিজড়িত স্থান এবং পাত্রের হদিশ দিতে পারবেন। কুয়ালালামপুরের ভারতীয় দূতাবাস থেকেই ইয়াঙ্গনের দূতাবাসে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন অভিজিৎবাবু। মওলামাইন পৌঁছেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ইয়াঙ্গন পৌঁছে গেছি একথা জানাতেই সিটওয়ে-র কনসাল জেনারেল ড. কুমার প্রভীন জানিয়েছিলেন, জনৈক ড. রামনিবাসজির সঙ্গে কথা বলতে। শুতে যাবার আগেই রামনিবাসজিকে ফোন করেছিলাম।

কথামতো পরদিন সকাল ঠিক আটটায় রামনিবাসজি পৌঁছে গিয়েছিলেন আমার হস্টেলের সামনে। মিনিট দশেক কথাবার্তার পর আমি বুঝেছিলাম দূতাবাসের কথায় ইনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন বটে, তবে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ সম্পর্কে কিছুই খবর রাখেন না। রামনিবাসজি বলেছিলেন, আমি মিয়ানমারে সনাতন ধর্ম স্বয়ংসেবক সংঘের মুখ্য প্রচারক। আসলে প্রধানমন্ত্রী মোদী (২০১৭) এবং রাষ্ট্রপতি কোভিন্দ (২০১৮)— দু'জনই ইয়াঙ্গন এসে আজাদ হিন্দের প্রাক্তনীদের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। তখনই যা খোঁজখবর করা হয়েছিল, এখন কে জানে কে কোথায় আছে? নেতাজির নামে কোনও ফলক বা স্মৃতিস্তম্ভ ইয়াঙ্গনে নেই। তবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে একটা বিরাট ফলক আমরা বসাতে পেরেছি এই ক'দিন আগেই, ৯ ফেব্রুয়ারিতে। তবে দু'-একজনের খোঁজ আমি আপনাকে দিতে পারি। একজন ইয়াঙ্গনেই থাকেন। অন্যজনের সঙ্গে দেখা করতে হলে গ্রামে যেতে হবে। চলুন এই বেলা আপনাকে ইয়াঙ্গনের আইএনএ ভেটেরানের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। আপনি খুঁজে পাবেন না। ওর নাম পেরুমল, তামিল; আমাদের সঙ্গে একদমই বনে না। তাই আমি বসব না। আপনাকে বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে চলে আসব।

রামনিবাসজি কথা রেখেছিলেন। দাঁড়াননি, দূর থেকে বাড়ি দেখিয়ে চলে গেছিলেন। ইয়াঙ্গন শহর সরলরৈখিক। সমস্ত ঠিকানাই এখানে কো-অর্ডিনেট সিস্টেমের অঙ্কের মতো। আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক হতদরিদ্র, নোংরা, দুর্গন্ধভরা ঘিঞ্জি বস্তিতে। ইয়াঙ্গন শহরের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আত্মপরিচয় হারিয়েছিল এই কানবে বস্তিতে এসে। সরু রাস্তা থেকে একটা দোকানের মধ্যে দিয়ে একটা কাঠের গোলা। সেই কাঠগোলার সামনে গিয়ে 'পেরুমলজি' বলতেই একমুখ হাসি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ

কিন্তু অপরাজিত এক বৃদ্ধ। আমি ‘জয় হিন্দ’ বলতেই বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আমার নাম সাব-লেফটেন্যান্ট কে পেরুমল। বুঝেছিলাম ঠিক জায়গাতেই এসেছি।

৫

পেরুমলজি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই একটা হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল। নানা বয়সের চার-পাঁচটি শিশু আমায় ঘিরে ধরেছিল। পেরুমলজি এক ধমক দিতেই দুদ্দাড় করে তারা পালিয়েছিল। বাড়ি ঠিক নয়, কাঠের একটা ছোট্ট ঘর, তার মধ্যে দেওয়াল তুলে আরও ছোট কিছু কুঠুরি। গত দেড়শো বছর ধরে এখানেই আমাদের বাস, বলেছিলেন পেরুমলজি। ভারী ধোঁয়ায় ভরে ছিল ঘর, সম্ভবত কয়লার উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। কাঠের মেঝেতে বসে ছিলেন পেরুমলজির স্ত্রী। আমি সটান ওঁর পাশে মাটিতে বসে পড়তেই ঘরসুদ্ধু লোক হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলেন। পেরুমলজির স্ত্রী ভাঙা হিন্দিতে তাঁর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে একে একে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। আরও বললেন, আমার ছেলেরা সবাই বর্মি মেয়েদের বিয়ে করেছে। বর্মি মেয়েরা খুব ভাল, জানো? আমাকে ঘরের একটা কাজও করতে দেয় না। আমরা তো তামিল, ঘরের মধ্যে আমরা তামিলই বলি; কিন্তু নাতি-নাতনিগুলোকে কিছুতেই তামিল শেখানো যাচ্ছে না। এখানকার স্কুলে তো বার্মিজ় ভাষা ছাড়া গতি নেই। অবশ্য পড়েই বা কী করবে? এখানকার কলেজে তো আর ভরতি হতে পারবে না আমাদের ছেলেমেয়েরা। কোথাও চাকরিও পাবে না! কারণ, আমাদের না আছে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব, না আছে ভারতের। তিন প্রজন্ম এদেশে বাস করার পরেও ফরেনারস রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ছাড়া আজও আমাদের কিছুই নেই। রোহিঙ্গাদের মতো আমাদেরও যে একদিন এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে না তা হলফ করে কেউ বলতে পারে না!

স্ত্রীকে থামিয়ে পেরুমলজি একটু বিব্রত স্বরে বলেছিলেন, ছেলেটাকে একটু বসতে দাও আগে। পরের প্রজন্মের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে পেরুমল পরিবারের দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছিল আমাকেও। সেটা বুঝতে পেরে পেরুমলজি বলেছিলেন, তুমি তো নেতাজি আর আজাদ হিন্দ ফৌজের গল্প শুনতে এসেছ ভাই, তাই না? মিছিমিছি আমাদের দুর্দশার কথা ভেবে মনখারাপ কোরো না। সেই যুদ্ধের সময় থেকেই যে দুর্দিন নেমে এসেছিল তা আজও কাটেনি। তবে হ্যাঁ, আজও এই যে দেখছ আমার দেওয়ালে সবথেকে বড় ছবিটা নেতাজির। আজও এই ছবির দিকে তাকালে যে শক্তি পাই মনের ভিতর তা বলে বোঝাতে পারব না। নেতাজি রেঙ্গুনে এসে একদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন আমাদের বাড়ির খুব কাছেই এক স্কুলের মাঠে। ওখানেই আমি প্রথম নেতাজিকে দেখেছিলাম। ব্যস, তার পরদিনই নাম লিখিয়েছিলাম ফৌজে। কিন্তু আমি তো খুব ছোট তখন, তাই আমাকে ভরতি করা হয়েছিল প্রোপাগান্ডা ডিপার্টমেন্টে। রোজ ব্যায়াম, প্রার্থনা, কুচকাওয়াজ ছাড়াও ভারতের ইতিহাস এবং রাজনীতির ক্লাস হত আমাদের। বলেই, বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত গিয়েছিলেন পাশের ঘরে। কয়েকমিনিট পরেই হাজির হয়েছিলেন হাতে একটা মোটা ফাইল এবং কয়েকটা বই নিয়ে। আমার পাশে বসে দেখিয়েছিলেন তাঁর ফৌজের সার্ভিস বুক, ব্যাজ। দেখিয়েছিলেন ১৯৪৬-এ রেঙ্গুনের আজাদ হিন্দ কমিটি নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে যে স্মারক বইটি ছাপিয়ে ছিল তার একটি কপি।

বলেছিলেন, একে একে সব ভেটেরানরা চলে যাচ্ছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তনীদের নথিপত্র আগলে এই আমি একাই পড়ে আছি। বিগত দু'দশক ধরে এখানকার দূতাবাসের মাধ্যমে অগণিতবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি ভারত সরকারের সঙ্গে, যদি পেনশন, কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়— এই আশায়। কোনও ফল হয়নি। অবশেষে ২০১৭ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এলেন, আমাদের মনে খুব আশা জন্মেছিল, মনে হয়েছিল এবার একটা কিছু হবে। কিন্তু মোদীজি আমাদের সঙ্গে কেবল একটি ছবি তুলেই চলে গিয়েছিলেন। আমাদের সম্মিলিত 'জয় হিন্দ'-এর জবাবে মোদীজি বলেছিলেন, নমস্কার। তখন খুব রাগ এবং দুঃখ হয়েছিল। একবার মনে হয়েছিল বলি, ভারতের স্বাধীনতা 'নমস্কার' এনে দেয়নি, 'জয় হিন্দ'-ই এনে দিয়েছিল। অবশ্য ছবি তোলা হয়ে যেতেই প্রধানমন্ত্রী ঘর থেকে চলে গেছিলেন। অতিরিক্ত একটা কথাও বলা, এমনকী হ্যান্ডশেক করার সুযোগও আমরা পাইনি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল এই মাসদুয়েক আগে যখন রাষ্ট্রপতি কোভিন্দ এসেছিলেন। আবার আমাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল দূতাবাসে। কিন্তু এবারও আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনার সময় রাষ্ট্রপতির ছিল না।

প্রসঙ্গ একটু বদলানোর জন্যই আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ক্যাম্বে নামে স্টেশনের খটকার কথা। শুনেই পেরুমলজি বলেছিলেন, আরে ব্রিটিশ আমলের ক্যাম্বে হল এই কানবে বস্তি। আর সেই স্টেশন তো খুবই কাছে। সার্কুলার লাইনের লোকাল ট্রেন চলে আজকাল। আগামীকাল আসতে পারবে? তা হলে তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাব সেই স্টেশন, আমাদের রিক্রুটমেন্ট সেন্টার, ট্রেনিং ক্যাম্প— সবকিছু। তবে আজ আমার বাড়িতে একটু ভাত না খাইয়ে তোমায় ছাড়ছি না।

৬

পেরুমলজির পাশে বসে সাম্বর, সবজি, আচার দিয়ে ভাত খাবার সময় মনে হয়েছিল এ এক পরম প্রাপ্তির মুহূর্ত আমার! পুরনো ছবিতে দেখেছিলাম আজাদ হিন্দের সৈনিকেরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একসারিতে খেতে বসতেন তাঁদের ছাউনিতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হত খোলা মাঠে, ভূমি আসনে। সিঙ্গাপুরের বিদাদরি থেকে রেঙ্গুনের মিংগালাডন ক্যাম্প, কোথাও এর ব্যতিক্রম হত না। মাঝেমধ্যে নেতাজি স্বয়ং সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেনাদের সঙ্গে বসে পড়তেন। খেয়ে দেখতেন খাবারের মান কেমন। ব্যাংককে তিলকরাজ পাওয়া এবং পরে আরও অনেকের কাছেই এরকম ঘটনার স্মৃতিচারণ আমি শুনেছিলাম। সেদিন পেরুমলজির পাশে বসে মনে হয়েছিল যেন আমিও পৌঁছে গেছি সেই ক্যাম্বে ট্রেনিং ক্যাম্পের মাঠে, যেখানে শয়ে শয়ে সৈনিক একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ সারছিল। একটা ঘোরের মধ্যে খাচ্ছিলাম, সংবিৎ ফিরেছিল পেরুমলজির স্ত্রীর কথায়। পেরুমলজির স্ত্রী বলেছিলেন, বাড়ির রান্নাবান্না এখনও তামিল ঘরানাতেই হয়। ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি— সকলেরই তামিল রান্না খুব প্রিয়। পেরুমল পরিবারকে সেদিনের মতো বিদায় জানিয়ে কানবে বস্তি থেকে সটান পৌঁছে গিয়েছিলাম বাহাদুর শাহ জফরের দরগায়।

পেরুমলজি বলেছিলেন দরগাটি শোয়েদাগন প্যাগোডার কাছেই জিওয়াকা স্ট্রিটে। বড় রাস্তার ওপর মূল দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটি আম গাছ আর গাছতলায় একটি ক্যান্টিন। লোকজন আছেন দেখে ক্যান্টিনেই

ঢুকে পড়েছিলাম। খোঁজ নিয়েছিলাম, মৌলবিসাহেব আছেন? থাকলে একটু কথা বলতাম। দোকানি আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন মৌলবি নাজির আহমেদ সাহেবের কাছে। দরগার প্রশস্ত দালানের একপ্রান্তে বসে ছিলেন মৌলবিসাহেব। একটু কাছে যেতেই চিনতে পেরেছিলাম। গত কয়েক বছরে, প্রথমে মনমোহন সিংহ এবং পরে নরেন্দ্র মোদী, দু'জনেই এসেছিলেন এই দরগায় তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে। দু'জনকেই দরগা ঘুরিয়ে দেখাতে হয়েছিল মৌলবি নাজির আহমেদকে। ভারতের টিভি চ্যানেলে আপনাকে দেখিয়েছে, আমার এই কথা শুনে মৃদু হেসে নাজিরসাহেব বলেছিলেন, আমি ছাড়া আর কে করত বলুন, ১৯৯৫ থেকে আমিই যে ইমাম এখানে। তবে আপনাকে নেতাজি সম্বন্ধে আমি আর কী বলব বলুন, যাঁরা জানতেন সেই বুজুর্গ লোকেরা সবাই চলে গেছেন। আপনি যান, ঘুরে দেখুন সব। দেখুন শুয়ে আছেন স্বাধীন ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট, ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক, সুফি সন্ত, কবি বাহাদুর শাহ জফর। পাশে শায়িত আছেন মহারানি জিনাত মহল এবং তাঁদের প্রিয় নাতনি রাজকুমারী রৌনক জামানি বেগম।

ঘোরার সুবিধার জন্য আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন একটি কিশোরকে। দরগায় ঢুকে কিছুক্ষণ বসেছিলাম সমাধির পাশে। ১৮৫৮ সালে ভারতীয় সেনা বিদ্রোহ দমনের পরই বাহাদুর শাহকে সপরিবারে ব্রিটিশরা নির্বাসন দিয়েছিল এই রেঙ্গুনে। স্বাধীন ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছিলেন এক বিচ্ছিন্ন একাকিত্বে। ব্রিটিশ অফিসাররা তাঁকে বলেছিল, পালানোর চেষ্টা করলে কুকুরের মতো গুলি করে মারব। ১৮৬২ সালে বাহাদুর শাহ মারা যাবার পর এমনভাবে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল যাতে কোনওদিন আর তা খুঁজে পাওয়া না যায়। স্থানীয় মুসলমানেরা অবশ্য ঘটনাটা জানতেন এবং মূলত তাঁদের দাবিতেই এখানে একটি ফলক ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ সরকার লাগাতে বাধ্য হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, এখানেই কাছাকাছি কোথাও দিল্লির প্রাক্তন রাজা বাহাদুর শাহের কবর ছিল। ১৯৯১ সালে অবশেষে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ভারতের শেষ মোগল সম্রাটের কবর। তৈরি হয়েছিল আজকের এই দরগা। প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রায় এই একই সময়ে বর্মার রাজা থিব (Thibaw)-কে সিংহাসনচ্যুত করার পর এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল ব্রিটিশরা। মহারাজ থিব এবং তাঁর পরিবারকে তারা আমৃত্যু নির্বাসন দিয়েছিল মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি ব্যাগ থেকে বার করেছিলাম আমার আজাদ হিন্দের পতাকা। অবাক হয়ে ছেলেটি আমার দিকে তাকাতেই, নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের একটা ছোট ঘটনা বলেছিলাম আমি। বলেছিলাম, ১৯৪৩-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, এখানেই এক বিশাল জমায়েত হয়েছিল ফৌজের। কুচকাওয়াজের পর নেতাজি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'কেবলমাত্র ভারতবর্ষের শেষ সম্রাটকে সম্মান জানাতে আজ আমরা এখানে সমবেত হইনি। আমরা সমবেত হয়েছি সেই মানুষটিকে স্মরণ করতে যাঁর পতাকার নীচে ভারতের সমস্ত ধর্মের মানুষ একজোট হয়ে একদিন লড়াই করেছিল ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এই সংগ্রামের নাম দিয়েছিল "সিপাহি বিদ্রোহ", আমরা বলি "ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ"।' সেদিন নেতাজির বক্তৃতার শেষে যুদ্ধে সাফল্য কামনা করে বিশেষ নামাজ এবং প্রার্থনা সভা হয়েছিল এখানে। মৌলবিসাহেবকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়েছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষ, বিগত সাত দশক ধরে, কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে আজাদ হিন্দ সেনার প্রাক্তন কর্মীদের

অবহেলা এবং বিস্মরণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে তার নির্মমতা ব্রিটিশ রাজত্বের থেকে কোনও অংশে কম নয়!

৭

বাহাদুর শাহের দরগা দেখে ফেরার পথে চোখে পড়েছিল এক বিশাল ভগ্নপ্রায় তিনতলা বাড়ি। অনধিকার প্রবেশ হচ্ছে জেনেও একটু ঝুঁকি নিয়েছিলাম। রাস্তার ওপরের দরজায় তালা না থাকায় বাড়ির সদর দরজার সামনে পৌঁছে যেতে পেরেছিলাম। মূল বাড়ির গায়ে আবছা হয়ে যাওয়া শ্বেতপাথরের দুটো ফলক ছিল। প্রথম ফলকটা পড়ে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফলকে লেখা ছিল, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। বাড়িটি কী ছিল তা বোঝার কোনও উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে আমায় ছবি তুলতে বারণ করেছিল। কথা না বাড়িয়ে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় ভিড় করেছিল। এটা মনে রাখা দরকার যে ১৯৩৯-এর এপ্রিলে নেতাজি কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফেলেছেন এবং দেশজুড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের কাজ করছেন। ১৯ আগস্ট ১৯৩৯, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে কলকাতায় মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে। ৩ সেপ্টেম্বর নেতাজি মাদ্রাজে থাকাকালীন যুদ্ধ আরম্ভের খবর পাচ্ছেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি মিটিংয়ে তাঁর বক্তব্য রাখছেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই মুহূর্তে আমার মাথায় একটাই প্রশ্ন এসেছিল— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক সপ্তাহ পরেও, কংগ্রেসের জরুরি মিটিংয়ে উপস্থিত না থেকে পণ্ডিত নেহরু রেঙ্গুনে কী করছিলেন? কেবলমাত্র একটা স্কুল বা কলেজবাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে নিশ্চয়ই আসেননি!

সন্ধের মুখে ফিরেছিলাম আমার হস্টেলে, ১৫ এবং ২২ নম্বর রাস্তা যেখানে মিশেছে। ম্যাপে দেখেছিলাম খুব কাছেই সুলে প্যাগোডা এবং ইয়াঙ্গন নদীর পাড় ধরে রয়েছে স্ট্র্যান্ড রোড— ঠিক যেন আমাদের কলকাতার গঙ্গার ধার। কিছুটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম একটু রাত করেই। আমার চিন্তাভাবনার সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে বিগত প্রায় একমাস ধরে কেবল নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ থাকলেও, ইয়াঙ্গন আসার পর থেকেই বারবার শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*-র দৃশ্যপট এসে পড়ছিল। ভাবতে না চাইলেও মনে এসে পড়ছিল শরৎবাবুর সৃষ্ট চরিত্র সব্যসাচীর দুঃসাহসিকতা, দেশপ্রেম এবং কোথায় যেন নেতাজির জীবনের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে তার একটা ভীষণ মিল। সুলে প্যাগোডা পার হয়ে মহাবান্দুলা রোড ধরে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। পথে এক ভারতীয় মিষ্টির দোকানে দেখেছিলাম রসগোল্লা, বরফি, বালুসাই থরেথরে সাজানো। আর তার গা ঘেঁষে সাজা হচ্ছে পান। মনে হয়েছিল, এই বুঝি অপূর্ব তার ঘর থেকে বেরিয়ে ধরবে নদীর ধারের পথ, ভারতীকে খুঁজতে গিয়ে কোনও এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করবে, 'এদিকে সাহেব-মেমেরা কোথায় থাকে জানো?'

আমার ফোনের বর্মি সিমকার্ডে সেই মুহূর্তে কিছু চিয়াটের রিচার্জ করা দরকার ছিল, তাই ঢুকে পড়েছিলাম একটা মোবাইল ফোনের দোকানে। কাজ হয়ে যেতে দোকানের একজন কর্মচারীকে প্রশ্ন করেছিলাম,

কাছেপিঠে কোথায় সাদামাটা রুটি-তরকারি পাওয়া যায় বলতে পারেন? ভদ্রলোক বলেছিলেন, এই ফুটপাথ ধরে একটু এগিয়ে যান, ব্যস। বাঁদিকে দেখতে পাবেন 'ভারত রেস্টুরেন্ট'। খুব ভাল খাবার, চলে যান। রেস্টুরেন্ট ফাঁকাই ছিল, মেনু দেখে বুঝেছিলাম খাবার মূলত দক্ষিণ ভারতীয়। ভারত রেস্টুরেন্টের ক্যাশ কাউন্টারে এক ভারতীয় ভদ্রলোকই বসে ছিলেন। মন বলেছিল ইনিই মালিক। এক প্লেট দোসা অর্ডার দিয়ে একরকম গায়ে পড়েই আলাপ জমিয়েছিলাম। বিদেশবিভুঁইয়ে গায়ে পড়ে আলাপে অনেক সময়ই অনেক উপাদান, নতুন তথ্য পাওয়া যায়। তবে সে-রাতে যা হয়েছিল তা আমি মোটেই আশা করিনি। আমার ইয়াঙ্গন আসার উদ্দেশ্য শুনে ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমার নাম শ্রীধরণ। আমার বাবা অচ্যুতন নায়ার ছিলেন মালয়েশিয়ার এক রাবার প্লান্টেশনের শ্রমিক। ১৯৪২-এ মালয়েশিয়াতেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবার পর চলে আসেন রেঙ্গুন। বাবা ফৌজের 'ওয়ার ফান্ড' বিভাগে কাজ করতেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর আর মালয়েশিয়ায় ফিরে যাননি, ১৯৪৬-এ খুলেছিলেন এই রেস্তরাঁ। ওই দেখুন বাবার ছবি। দোসা খেতে এসে এইভাবে আরও একজন আজাদ হিন্দের ভেটেরানের খোঁজ পেয়ে যাব স্বপ্নেও ভাবিনি! খাওয়া শেষ হতেই শ্রীধরণ বলেছিলেন, দয়া করে দাম দেবেন না। আমি জোর করায় বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনেকদিন পর বাবার কথা মনে পড়ে গেল আজ। আপনি প্লিজ় দাম দেবেন না। ধন্যবাদ জানিয়ে হস্টেলে ফেরার পথ ধরেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সিঙ্গাপুর থেকে চলা শুরু করে গুরুদোয়ারা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্রাঙ্গণ, রেলস্টেশন, পোড়োবাড়ি, বালক সেনা, বালিকা সেনা, প্রাক্তন ফৌজি এবং এক দুর্লভ পেন্টিং-এর মতো এই ভারত রেস্টুরেন্টও নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের এক উত্তরাধিকার!

৮

পরদিন সকালে আবার পৌঁছে গিয়েছিলাম কানবে স্টেশন রোড। পৌঁছতেই দেখি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরনোর জন্য একেবারে ধোপদুরস্ত পোশাকে রেডি হয়ে বসে আছেন পেরুমলজি। সঙ্গে রয়েছেন আরও দুই সত্তরোর্ধ্ব ভদ্রলোক। পেরুমলজিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এঁরা হলেন জয়হিন্দ এবং সুব্রহ্মনিয়ম। এঁদের বাবারা ছিলেন আমার বন্ধু। সুব্রহ্মনিয়মের বাবা উদাইয়ার থেভার ছিলেন ফৌজের ড্রাইভার আর জয়হিন্দের বাবা গোভিন্দন নায়ার ছিলেন মিলিটারি পুলিশ। ছেলের নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ গোভিন্দন কীরকম নেতাজিভক্ত ছিলেন? তোমাকে আমি আজ পুরনো কয়েকটা জায়গা দেখাব শুনে এঁরাও সঙ্গে যাবেন বলছেন। আসলে আমি মারা যাবার পর আর কেউ এই ইয়াঙ্গন শহরের এইসব পুরনো ঠিকানার হদিশ পাবে না। তাই ওঁরাও দেখে রাখুন। তোমার আপত্তি নেই তো? গাড়ির ব্যবস্থা করাই ছিল। গাড়িতে উঠেই পেরুমলজি আমাকে বলেছিলেন, প্রথমেই দেখব সেই কানবে রেলস্টেশন, আর তারপর তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের রিক্রুটমেন্ট সেন্টারে।

পরের কয়েক ঘণ্টা ইয়াঙ্গন শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম আমরা চারজন। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে পেরুমলজি এবং পিছনে আমি, সুব্রহ্মনিয়ম উদাইয়ার এবং জয়হিন্দ রামন। সামনে বসে কখনও ড্রাইভারকে পথনির্দেশ দিচ্ছিলেন নব্বই ছুঁইছুঁই পেরুমল, আবার কখনও পিছন ফিরে আমাকে বলছিলেন পুরনো দিনের গল্প। গাড়ি ঢুকেছিল একটি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির চত্বরে। সুব্রহ্মনিয়ম বলেছিলেন,

এই হল তামিল গণেশ মন্দির। পেরুমলজি বলেছিলেন, গণেশ মন্দির তো এখন হয়েছে, আগে এই মন্দিরের সামনে যে দোতলা বাড়িটি দেখছ, সেখানেই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের রিক্রুটমেন্ট সেন্টার। আমি এখানেই ফৌজে ভরতি হয়েছিলাম। তারপর চেট্টিয়ার স্কুলের ক্যাম্পাসে পৌঁছে বলেছিলেন, এখানেই ছিল ট্রেনিং সেন্টার। ক্যাম্পাস আজ পরিত্যক্ত, ছড়িয়ে থাকা বাড়িঘরগুলোও ভেঙে পড়ছে। সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে তিন বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে ঘুরছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল ঠিক যেন *লর্ড অফ দি রিংস* গল্পের তিনজন ট্রি-বিয়ার্ড আমাকে এক প্রাচীন রহস্যের গুপ্ত চাবিকাঠির হদিশ দিচ্ছেন।

পেরুমলজি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে যাচ্ছিলেন, এইটা ছিল ওয়্যারলেস ঘর, এইখানে আমাদের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটার থিন্মাইয়া সাহেব থাকতেন, আর এই বেদিটা দেখছ? এখানেই রোজ সকালে পতাকা উত্তোলন হত। এই বেদির পাশে আমি দাঁড়াচ্ছি, আমার একটা ছবি তুলে দেবে? বহু বছর পর আজ আবার এখানে এলাম। বর্মা সরকার এইসব জমি নিয়ে নিয়েছে। সামনের বছর সম্ভবত এসব পুরনো বাড়িঘর কিছুই থাকবে না। চলো এবার যে ঠিকানাটা তুমি সকাল থেকে জিজ্ঞেস করছ সেই '৯৪ পার্ক রোড' তোমাকে দেখানোর সময় হয়েছে। বলেই, বয়সে প্রায় বিশ বছরের ছোট জয়হিন্দ এবং সুব্রহ্মনিয়মের থেকে জোরে হাঁটা লাগিয়েছিলেন পেরুমলজি। মনে হয়েছিল কোনও এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর ওপর ভর করেছে।

ইয়াঙ্গন শহরে আসার অনেক আগে থেকেই আমি শাহনওয়াজ খান এবং লক্ষ্মী সেহগালের লেখায় পাওয়া ঠিকানা '৯৪ পার্ক রোড' খুঁজছিলাম। ৫ এপ্রিল ১৯৪৪, রেঙ্গুনে এই ঠিকানাতেই গড়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দ সেনার নিজস্ব ব্যাংক— 'দি ন্যাশনাল ব্যাংক অফ আজাদ হিন্দ লিমিটেড'। আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলের অধিকার পাওয়ার পর আজাদ হিন্দের অস্থায়ী সরকার এক প্রকৃত সরকারের পরিচয় দিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে বর্মার জিয়াওয়াদি অঞ্চলও আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে চলে আসে। নেতাজি বিশ্বাস করতেন ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে যেমন স্বাধীনতার যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই ভিক্ষা করে বেশিদিন স্বাধীন সরকার চালানো সম্ভব নয়। নেতাজির সেই দর্শন থেকেই জন্ম নিয়েছিল আজাদ হিন্দ ব্যাংক। কানদগি লেকের গা-ঘেঁষে চলা একটা রাস্তায় আমাদের গাড়ি পৌঁছে যেতেই পেরুমলজি সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ইশারায় জাপানের দূতাবাস ছাড়িয়ে একটা ছোট রাস্তায় আমাদের গাড়ি বাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একেবারে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েছিল এক ঝকঝকে নতুন বাড়ি। সামনে লেখা ছিল— 'ইউনিয়ন বিজনেস সেন্টার'। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে পেরুমলজি বলেছিলেন, এখানেই ছিল আজাদ হিন্দ ব্যাংক। পার্ক রোড আজ নাম বদলে ন্যাট মক রোড। ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে রেঙ্গুনের ব্যবসায়ী জনাব হাবিব বেতাই ব্রিটিশ মুদ্রার এক কোটি তিন লক্ষ টাকা ছাড়াও গাড়ি, বাড়ি, অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি— সবকিছু দান করেছিলেন এই ব্যাংক তহবিলে। জনাব হাবিব নেতাজিকে বলেছিলেন, আমাকে পরিবর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি উর্দি দিলেই হবে। জনাব হাবিবের স্ত্রী শ্রীমতী হিরাবেন তাঁর পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের অলংকার দান করেছিলেন সেই একই দিনে। নেতাজি নিজে এই দু'জনকে 'সেবক-এ-হিন্দ' এবং 'সেবিকা-এ-হিন্দ' সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। ঠিকই শুনছ, একজন মুসলমান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নেতাজির হাতে নিজের সর্বস্ব দান করে ফকির হয়ে যেতে একমুহূর্ত দ্বিধা করেননি!

৯

আজাদ হিন্দ ব্যাংক কোথায় ছিল দেখানোর পর পেরুমলজি আবার হাঁটা শুরু করেছিলেন। গলি, তস্য গলি পার হয়ে এক পুরনো বাংলোবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, এখানে শাহনওয়াজ খান থাকতেন। তখন এই রাস্তার নাম ছিল জালান অ্যাভিনিউ। খুব কাছেই ছিল আর একটা বাড়ি যেখানে নেতাজি থাকতেন। এখন সেই বাড়ি আর নেই। ওই একই জমিতে তৈরি হয়েছে নতুন একটা ডুপ্লে গোছের বাড়ি। নিরাপত্তা দেখে মনে হয়েছিল খুব সম্ভবত মিয়ানমার আর্মির কোনও বড় অফিসার ওখানে থাকেন। আমি একটু উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করতেই আমাকে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, মিলিটারি জুনটার নজর সর্বত্র। একে আমাদের নাগরিকত্ব নেই, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে অহেতুক বিপদ বাড়তে পারে, তখন তুমিও ছাড় পাবে না। কত যে বিদেশি পর্যটক তাদের অতিরিক্ত কৌতূহলের জন্য বিনা বিচারে জেলে গেছে এখানে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। মিয়ানমার এবং তার আধুনিক ইতিহাস দেখলে জর্জ অরওয়েল-এর *১৯৮৪* উপন্যাসের সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থার কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মিয়ানমারে অরওয়েল পড়া নিষিদ্ধ ছিল। তবে, *১৯৮৪*-র থেকেও বার্মিজ জুনটার বেশি আপত্তি ছিল তাঁর উপন্যাস *দি বার্মিজ় ডেইজ়* নিয়ে। মজার ব্যাপার হল, বিগত কয়েক বছরে পর্যটনে জোয়ার আসার পরেই দেখা গিয়েছিল বহু পর্যটক মিয়ানমারে অরওয়েলের স্মৃতিবিজড়িত মওলামাইন, মেমিও এবং কাথা-র মতো জায়গাগুলিই ঘুরে দেখতে চাইছেন। তাই এখন আবার অরওয়েলের বই কিনতে পাওয়া যাচ্ছে মিয়ানমারে, এমনকী *দি বার্মিজ় ডেইজ়* অনূদিত হয়েছে বর্মি ভাষায়!

তিন বৃদ্ধের সঙ্গে সারাদিন ইয়াঙ্গন ঘুরে নিজের হস্টেলে ফেরার সময় মনে হয়েছিল হ্যামলেটের পরলোকগত পিতার আত্মার মতো নেতাজি আজও কাজ করে চলেছেন এইসব মানুষের মধ্যে। পেরুমলজি বলেছিলেন আরও কিছুদিন ইয়াঙ্গনে থেকে যেতে। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। ড. রামনিবাসের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ হয়েছিল জিয়াওয়াদি গ্রামের শিবদাসজির সঙ্গে। শিবদাসজি বলেছিলেন, ইয়াঙ্গন থেকে সকাল ছ'টার মান্দালয়গামী ট্রেন ধরতে। বলেছিলেন, ফিউ স্টেশনে নামবেন, ইয়াঙ্গন থেকে ঘণ্টা ছয়েক লাগবে। মিয়ানমারের দূরের ট্রেনগুলোর সিট রিজার্ভেশন করা সম্ভব এবং সেই টিকিট দেওয়া হয় যাত্রার একদিন আগে। দিনের ট্রেনগুলিতে দুটো শ্রেণি রয়েছে— অর্ডিনারি এবং ফার্স্ট ক্লাস। হাতে গোনা কয়েকটা রাতের ট্রেনও চলে। তাতে অবশ্য স্লিপার ক্লাস আছে। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম ইয়াঙ্গন সেন্ট্রাল স্টেশনে। ঘড়ি ধরে সকাল ছ'টায় ট্রেন ছেড়েছিল। ফিউ স্টেশনে পিঠে রুকস্যাক নিয়ে একজনই ট্রেন থেকে নেমেছিল। ফলে শিবদাসজির আমাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি। স্টেশনের বাইরে পা রাখতেই শিবদাসজি বলেছিলেন, প্রথমেই আপনাকে নিয়ে যাব জিয়াওয়াদি গ্রামে। আজ গ্রামের প্রবীণ হীরা মাস্টারের বাড়ি *গীতা* পাঠের অনুষ্ঠান আছে। ওখানেই প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা। গ্রামের সবাই আজ ওখানে উপস্থিত। আর ওখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন কালিপ্রসাদ মাহতো। ফিউ থেকে মান্দালয় হাইওয়ে ধরে ৬ কিলোমিটার উত্তরে যেতেই এসে পড়েছিল জিয়াওয়াদি। পাকা রাস্তা ছেড়ে আমাদের গাড়ি ধরেছিল মেঠো পথ। লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে আমাদের গাড়ি যখন হঠাৎ থেমে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল বীরভূমের কোনও গ্রামে এসে পৌঁছেছি। উঠোনের একদিকে তেরপল পেতে সার দিয়ে প্রসাদ

খেতে বসেছিলেন গ্রামের লোকজন। গৃহকর্তা হীরা মাস্টার এগিয়ে এসে আমাকে এবং শিবদাসজিকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ির ভিতর পা রাখতেই ঘরের এককোণে বসে থাকা একজন মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শিবদাসজি পাশ থেকে বলেছিলেন, ইনিই কালিপ্রসাদ মাহতো, এবছর ১০১-এ পা দিলেন। নেতাজির কাজে আপনি ভারত থেকে আসছেন শুনে সকাল থেকে এখানে ঠায় বসে আছেন। আমি কাছে গিয়ে 'জয় হিন্দ কালিপ্রসাদজি' বলতেই এক বিদ্যুতের ঝলক খেলে গিয়েছিল বৃদ্ধের চোখে। তারপর টানা একঘণ্টা আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন কালিপ্রসাদজি। কেমন করে ফৌজে ভরতি হলেন, ট্রেনিংয়ের সময় কেমন করে প্রথম গুলিতেই লক্ষ্যভেদ করে অফিসারের প্রিয় পাত্র হলেন— এইসব। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার কি কখনও ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধের সুযোগ হয়েছিল? শুনেই চোখ জ্বলে উঠেছিল কালিপ্রসাদের। হাতের লাঠি বন্দুকের মতো তুলে বলেছিলেন, আমার হাতিয়ার ছিল ব্রেন গান। সত্তরটা গুলি ভরা যেত তাতে। আমাদের প্রথম লড়াই হয়েছিল মেইকটিলার ময়দানে, তারপর মাউন্ট পোপায়। মেইকটিলায় আমরা একবার একজন ব্রিটিশ গুপ্তচরকে ধরেছিলাম। কয়েকদিন কয়েদ করে রাখার পর আমাদের অফিসার শিব সিং ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এই প্রথম আমার সামনে বসেছিলেন আজাদ হিন্দের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একজন সৈনিক!

১০

মাস্টারমশায়ের বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার পর শিবদাসজি বলেছিলেন, আজ দ্বাদশী উপলক্ষে আমাদের গ্রামে হিন্দু মহাসভার রামনাম সংকীর্তনে আপনাকেও থাকতে হবে। গ্রামের স্কুলবাড়ির দোতলার সভাঘরে শিবদাসজি এবং কালিপ্রসাদজির সঙ্গে আমি সেখানে ঢুকতেই একটা গুঞ্জন উঠেছিল। জনা পঞ্চাশ মধ্যবয়স্ক পুরুষ শতরঞ্চি পেতে বসেছিলেন। একজনও মহিলা উপস্থিত ছিলেন না। শিবদাসজি আমার কানে কানে বলেছিলেন, আপনাকেও কিন্তু দু'-চার কথা বলতে হবে। আপনি আজ আমাদের বিশেষ অতিথি কিনা! মনে মনে প্রমাদ গনেছিলাম আমি। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-এর* একটি জনপ্রিয় শ্লোক 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' মনে পড়েছিল। ছোটবেলায় শেখা সুরে সেই শ্লোক গাইতেই তুমুল হর্ষধ্বনি পড়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছিলেন অনেক প্রশ্ন নিয়ে। আমার মুখে নেতাজি এবং সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার মন্দিরের ঘটনা শুনে সবাই হেসে বিদায় নিয়েছিলেন। সেই হাসির অন্ধকারে চাপা পড়ে গিয়েছিল নেতাজির 'বিশ্বাস, একতা এবং বলিদান'-এর স্লোগান।

সভা থেকে বেরিয়ে আসার সময় শিবদাসজি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বলেছিলেন, ইনি আমাদের গ্রামের ডাক্তারবাবু, আপনার মতো ইনিও বাঙালি। ডাক্তারবাবু হেসে বলেছিলেন, চলুন আমার বাড়ি, একটু কথা বলা যাবে। স্কুলের খুব কাছেই কাঠের দোতলা বাড়ি। বাড়িতে ঢোকার মুখেই ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, আমি ডি এন দাশগুপ্ত। আমার বাবা ছিলেন জিয়াওয়াদির চিনিকলের ডাক্তার। আমি কিন্তু পাশ করা ডাক্তার নই। বাবার সঙ্গে থেকেই যা শিখেছিলাম সেই বিদ্যা দিয়েই এত বছর এই গ্রামে

কাটিয়ে দিলাম। আজকাল রোগী দেখি, কিন্তু ফি নিই না। তবে আমার ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই ভারতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করে এসেছে। ওরা এখন ইয়াঙ্গনে থাকে। মাঝেমাঝে এসে আমাদের দেখে যায়। আসলে আমার স্ত্রী শয্যাশায়ী হয়ে যাবার ফলে আমি এই গ্রাম ছেড়ে নড়তে পারি না। তা আপনি আমাদের এই 'লিটল বিহার' কেমন দেখছেন বলুন? আশেপাশের কয়েকটা গ্রাম মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ ভারতীয় থাকেন এখানে, জানেন তো? সকলেই বিহারের মানুষ এবং লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা— ভোজপুরী। যাকগে, একটু শরবত বানিয়ে দিই আপনাকে? যা রোদ উঠেছে আজ! পাঁচ মিনিটের আলাপেই ডা. দাশগুপ্তকে ভীষণ পরিচিত মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের বর্মা মুলুকের একটি চরিত্র যেন কোনও মন্ত্রবলে আজও রয়ে গেছে এই জিয়াওয়াদি গ্রামে। কয়েকমিনিট পর ডা. দাশগুপ্ত হাতে এক গ্লাস শরবত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, জিয়াওয়াদি এবং আশেপাশের বেশ কয়েকটা গ্রাম গড়ে উঠেছিল ১৯৩৪-৩৫ সালে। ব্রিটিশ সরকার বিহারের ডুমরাওয়ের মহারাজের দেওয়ানকে এই গোটা অঞ্চল দান করেছিল। দেওয়ান জয়প্রকাশ এবং তাঁর ছেলে হরিহরপ্রসাদ বিহারের আরা জেলা থেকে হাজারে হাজারে শ্রমিক পরিবারকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। সেই শ্রমিকদের হাত ধরেই এখানে তৈরি হয়েছিল এক বিশাল সুগার মিল। সেই চিনিকল আর নেই। মিয়ানমার সরকার নতুন করে একটা কারখানা চালু করার চেষ্টা করছে বটে, তবে এলাকার মানুষের আর আখ চাষ কিংবা চিনিকলে চাকরি— কিছুতেই আগ্রহ নেই।

পরদিন সকালে সুগার মিলের ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে মেঠো রাস্তায় চলা গোরুর গাড়িকে ওভারটেক করে আমাদের মিয়ানমারি ভ্যানো গাড়ি পৌঁছেছিল গহদুগড়ের ধু-ধু মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক শিবমন্দিরে। কালিপ্রসাদজি বলে দিয়েছিলেন এই মন্দিরের গাঁ ঘেঁষেই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং রানি ঝাঁসি বাহিনীর সেনাছাউনি। ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৫, এখানে এসে পৌঁছেছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগাল এবং তাঁর রেজিমেন্ট। চিনিকলের হাসপাতালটিকে পরিবর্ধিত করে যুদ্ধে ঘায়েল সৈনিকদের পরিচর্যার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৫, এখানেই নেতাজির জন্মদিন পালন করা হয়েছিল। গ্রামের লোকেরা চিনি এবং চাল দিয়েছিলেন। সারাদিন সকলের খুব আনন্দে কেটেছিল। কিন্তু সেই রাতেই ব্রিটিশ বোমারু বিমান হাসপাতাল, চিনিকল, সব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। কত যে সাধারণ শ্রমিক এবং রোগী মারা গিয়েছিল তার হিসেব ছিল না। যাঁরা একটু কম ঘায়েল ছিলেন তাঁদের রেঙ্গুন পাঠানোর ব্যবস্থা করে কালেওয়াতে একটি নতুন হাসপাতাল খোলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী। আজ হাসপাতাল নেই, চিনিকল নেই, সেনাছাউনির চিহ্নও নেই; রয়ে গেছে কেবল মন্দিরের পাশে সেই অশ্বত্থগাছ যার তলায় দাঁড়িয়ে নেতাজি একবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। গহদুগড় গ্রামের বয়স্ক মানুষ এবং মন্দিরের পূজারিদের সঙ্গে নিয়ে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই অশ্বত্থগাছের তলায়। ছবি তোলার সময় আমার মনে পড়েছিল, বোমা পড়ার পর থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরোধিতা শুরু করেছিল এই গ্রামেরই মানুষজন। আজ আজাদ হিন্দের পতাকা হাতে নিয়ে ছবি তোলার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে!

১১

গহদুগড় থেকে আবার ফিরে এসেছিলাম জিয়াওয়াদি। আগেই খবর পেয়েছিলাম শান্তিলাল মাহতো নামের আরও এক প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজি আছেন চৌকটাগা গ্রামে। ইয়াঙ্গন থেকে জিয়াওয়াদি আসার সময় ট্রেন থেকেই দেখেছিলাম এই স্টেশন। শিবদাসজি বলেছিলেন দুপুরে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসে মান্দালয় থেকে। আপনি চাইলে ওই ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চৌকটাগা পৌঁছে যেতে পারবেন। ফোন করে চৌকটাগায় খবরও পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমি ট্রেনে ওঠার সময় বলেছিলেন, শান্তিলালজির ভাই কান্তিলাল আপনার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করবেন। আমি কান্তিলালকে আপনার বিবরণ দিয়ে দিয়েছি। উনি আপনাকে ঠিক চিনে নেবেন। শিবদাসজি এবং জিয়াওয়াদি গ্রামকে বিদায় জানিয়ে ইয়াঙ্গনগামী দুপুরের ট্রেনে চেপে বসেছিলাম। গন্তব্য চৌকটাগা। কান্তিলালজি কথা রেখেছিলেন। স্টেশন থেকে সরাসরি নিয়ে গেছিলেন সনাতন ধর্ম সেবাসদনে। রাস্তার ওপরে সরস্বতী মন্দিরের পাশ দিয়ে সেবাসদনের প্রবেশপথ। ভিতরে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সুর করে কিছু একটা কণ্ঠস্থ করছিল। অফিসঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শান্তিলাল মাহতো।

পরের একঘণ্টা শান্তিলালজির সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছিল, নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু তাঁর বলার ছিল। এতদিন কেউ সেইসব তাঁর কাছে জানতে চায়নি। কালিপ্রসাদজির সঙ্গে দেখা হবার পরদিনই যে আরও একজন মেইকটিলা, মাউন্ট পোপা, মান্দালয় এবং টাউঙ্গুর সম্মুখসমরে অংশ নেওয়া সৈনিকের দেখা পাব, তা আশা করিনি! দেখেছিলাম, তিরানব্বই বছর বয়সেও স্মৃতিশক্তি একটুও ম্লান হয়নি ভদ্রলোকের। গল্প করেছিলেন, তাঁর কাকা রামপরিখা সিং-এর সঙ্গে প্রথমবার কানবের স্কুলমাঠে নেতাজির বক্তৃতা শোনার কথা। বলেছিলেন, ওই বক্তৃতা শুনে নিজেকে ধরে রাখা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না বাবুজি। আমি চৌকটাগা ফিরেই ফৌজে নাম লিখিয়েছিলাম। ট্রেনিং শুরু হয়েছিল কাছের রামদেব বস্তির মন্দিরের মাঠে। আমাদের অফিসারের নাম ছিল আশ্রয় সিং, আর আশ্রয় সিং রিপোর্ট করতেন ওয়াতানাবে নামের একজন জাপানি অফিসারের কাছে। নেতাজিও একবার এসেছিলেন আমাদের চৌকটাগা ক্যাম্পে। মন্দিরের পাশের মাঠেই তাঁর বক্তৃতা হয়েছিল। নেতাজি আসার আগেই আমাদের জাতীয় সংগীত শিখতে হয়েছিল। কর্নেল জাহাঙ্গীর এবং কর্নেল মুস্তাক আঙ্গেরিয়ারের গলায় আমরা প্রথম আজাদ হিন্দের জাতীয় সংগীত শুনেছিলাম। বলেই গুনগুন করে ‘শুভ সুখ চৈন কি বরখা বরষে ভারত ভাগ্য হ্যায় জাগা’ গাইতে শুরু করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, নেতাজির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের ‘জন গণ মন’ অবলম্বনে ১৯৪৩-এ দেশবন্দনার এই গানটি লিখেছিলেন মুমতাজ হুসেন এবং নেতাজির সাবমেরিন যাত্রার সঙ্গী আবিদ হাসান সাফরানি। ‘শুভ সুখ চৈন’-কে কৌমি তারানাও বলা হয়। সুরকার ছিলেন ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুর। ‘কদম কদম বাড়ায়ে যা’ গানের সুরও রাম সিং ঠাকুরের দেওয়া। নেতাজি স্বয়ং একটি জার্মান বেহালা উপহার দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরকে। আজাদ হিন্দ ফৌজ রেঙ্গুনে আত্মসমর্পণের পর অনেকের সঙ্গে রাম সিং-ও ভারতে ফিরেছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭, লালকেল্লায় পণ্ডিত নেহরুর প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সেই বেহালাতেই জাতীয় সংগীত বাজিয়েছিলেন রাম সিং। দুঃখের ব্যাপার হল, শেষজীবনে এই রাম সিং ঠাকুরকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্বীকার করতে ভারত সরকার অনেক সময় নিয়েছিল। এমনকী উত্তরভারতে একদল মানুষ আদালতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে ‘কৌমি তারানা’ এবং ‘কদম কদম বাড়ায়ে যা’— এইসব গানের সুর অন্য কারও দেওয়া!

শান্তিলালজিকে বিদায় জানিয়ে ছুটেছিলাম আরও প্রত্যন্ত গ্রাম থাটেগাঁও। দেখা হয়েছিল বালক সেনা দীননাথ প্রসাদের সঙ্গে। বয়স কম ছিল তাই মুখোমুখি লড়াইয়ে অংশ নিতে পারেননি। সেই আফশোস বালক সেনা দীননাথের জীবনের অন্তিম অধ্যায়েও যায়নি দেখেছিলাম। রাতে কান্তিলালজির বাড়ি ডাল, রুটি, ফুলকপির তরকারি আর তেঁতুলের আচার দিয়ে রাতের ভোজ সেরে মান্দালয়ের বাসে উঠেছিলাম। পিচ ঢালা অন্ধকারে মান্দালয় হাইওয়ে ধরে আমার বাস চলছিল। জানলা দিয়ে নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ভাবছিলাম গত দু'দিনের কথা। মনে পড়ছিল, হাতে একটা লাঠি নিয়ে কালিপ্রসাদের ব্রেন গান চালানোর অঙ্গভঙ্গি, শান্তিলালের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত এবং দীননাথ প্রসাদের লড়াই করতে না পারার আক্ষেপ। মনে হয়েছিল এখনও অবধি যত প্রাক্তন ফৌজির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক গভীর বিষাদ কাজ করে চলেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাঁদের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের কোনও মূল্য দেওয়া দূরের কথা, দেখেও-না-দেখার এক ঠান্ডা মাথার খেলায় তাঁদের ক্রমাগত অপমান করে চলেছে। তবু যেন কোনও এক অদৃশ্য শক্তি এই মানুষগুলির মধ্যে আজও কাজ করে চলেছে। নেতাজির নাম এবং 'জয় হিন্দ' শুনে তাঁদের চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যেতে আমি যে নিজের চোখে দেখেছি!

১২

রাতের বাস ছুটছিল মান্দালয়ের দিকে। আমি ভাবছিলাম দেশনায়কের পথে বেরনোর আগে জিয়াওয়াদির নাম জানলেও, গহদুগড়, চৌকটাগা, থাটেগাঁও এসব কিছুই আমার মানচিত্রে ছিল না। কোনও বইতেই এইসব গ্রামের উল্লেখ আমি পাইনি, ফলে আমার পরিকল্পিত ভ্রমণপথে এগুলো ছিল না। মিয়ানমার প্রবেশ করার আগেও কোনওদিন ভাবিনি আমি এইসব গ্রামে যাব, দেখতে পাব মিয়ানমারের অন্য এক ছবি এবং দেখা হবে আজাদ হিন্দের প্রাক্তন সেনাদের সঙ্গে। তাই মনে হয়েছিল, এই হল যে-কোনও গবেষণায় ফিল্ড ওয়ার্কের অপরিহার্যতার প্রমাণ।

প্রাথমিকভাবে আমার পরিকল্পনা ছিল, ইয়াঙ্গনের কাজ সেরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মার দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র মেইকটিলা এবং মাউন্ট পোপা যাবার। কিন্তু ইয়াঙ্গনে থাকতেই খবর পেয়েছিলাম মেইকটিলা এবং পোপায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সস্তায় থাকার উপায় নেই এবং বার্মিজ়-ইন্ডিয়ানদের বসতিও নাকি ছত্রভঙ্গ। অথচ, কয়েক বছর আগেও মেইকটিলার ৩০ শতাংশ মানুষ ছিলেন বার্মিজ়-ইন্ডিয়ান এবং মূলত মুসলমান। ২০১৩-র এক দাঙ্গায় ১২০০০ বার্মিজ়-ইন্ডিয়ান ঘরছাড়া হয়েছিলেন এবং সেই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। মিলিটারি এবং পুলিশ দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। এখন বাগানের রাজার কাটানো এক বিশাল হ্রদ ছাড়া মেইকটিলায় দর্শনীয় আর কিছুই নেই। মেইকটিলা যুদ্ধক্ষেত্রের বিশাল ময়দানও চলে গেছে মিয়ানমার এয়ারফোর্সের দখলে। এইসব জানার পর মেইকটিলা যাবার ব্যাপারে মনের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিলই। আর ঠিক সেই সময়ে দূতাবাস মারফত জিয়াওয়াদির যোগাযোগ গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছিল।

জিয়াওয়াদি যাবার আগে অবশ্য আমার রাখাইন অঞ্চলে ঢোকার ইচ্ছে ছিল। বার্মিজ় জুনটার রোহিঙ্গা গণহত্যার পরের রাখাইন দেখার জন্য নয়, রাখাইনে আমার প্রয়োজন ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের যাত্রাপথের গবেষণার কারণেই। কিন্তু ইয়াঙ্গনে জানতে পেরেছিলাম, রাখাইনের যে শহরে আমার কাজ সেখানে গাড়ির রাস্তায় বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এখন প্রশ্ন হল, আজাদ হিন্দ সম্পর্কিত কী এমন ছিল রাখাইনে যে আমি যেতে চাইছিলাম? উত্তর হল, কেবলমাত্র মণিপুরের মোইরাং নয়, আজকের মিয়ানমারের রাখাইনে এবং চিন প্রদেশের লাগোয়া বাংলাদেশের মাটিতেও উড়েছিল ভারতের পতাকা!

৭ জানুয়ারি ১৯৪৪, সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দের হেড কোয়ার্টার সরে এসেছিল রেঙ্গুন। ৩ ফেব্রুয়ারি, নেতাজি বক্তৃতা দিয়েছিলেন গোটা বাহিনীর উদ্দেশে। ফৌজের তিনটি ব্যাটালিয়ন যখন রেঙ্গুন ছেড়ে বেরিয়েছিল তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তিদিম, টামু এবং ইম্ফল দখল করা। পরদিন, ৪ ফেব্রুয়ারি, মেজর পি এস রাতুরির নেতৃত্বে সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটালিয়ন রেঙ্গুন থেকে ট্রেনে পৌঁছেছিল প্রোম। প্রোম থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে টাউংগুপ, মিও হাউং হয়ে মার্চ মাসের মাঝামাঝির মধ্যে তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল রাখাইন প্রদেশে, কালাদান নদীর পাড়ে চিয়াউকটো-তে।

এখান থেকেই মেজর রাতুরির নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক এবং সফল এক অপারেশন। কালাদান নদীর অন্যপাড়ে ততদিনে ব্রিটিশরা আমদানি করেছিল তাদের ওয়েস্ট আফ্রিকান ডিভিশন। মাত্র তিনশো জওয়ান সম্বল করে এই আফ্রিকান সৈন্যদের ক্যাম্পে একের পর এক আঘাত হানতে থাকে আমাদের সৈনিকরা। বেশিরভাগ অপারেশনই তারা করেছিল রাতের অন্ধকারে। অনেক বেশি সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্র, কামান ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। একে একে আজাদ হিন্দের দখলে চলে আসে টেটমা, পালেটওয়া গ্রাম। তারপর, ১৯৪৪-এর মে মাসে, এক নৈশ অপারেশনে ভারত সীমান্ত (এখন বাংলাদেশ) পেরিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে দেয় মেজর রাতুরির ব্যাটালিয়ন। মেজর রাতুরি শাহনওয়াজ খানকে বলেছিলেন, ভারতের মাটিতে পা রাখার মুহূর্ত ছিল অবিস্মরণীয়! আমাদের সৈনিকেরা সবাই আনন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ভঙ্গিতে ভারতের মাটিকে চুম্বন করেছিল। ভারতের যে অঞ্চলে এই গৌরবময় ঘটনা ঘটেছিল তার নাম মুদক। আজকের বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে বান্দারবনের খুব কাছেই এই জায়গা। ১৯৪৪-এর মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মুদকে উড়েছিল স্বাধীন ভারতের পতাকা। মুদক ক্যাম্প অহরহ ব্রিটিশ সেনা এবং যুদ্ধ বিমানের আক্রমণ সহ্য করে আগলে রেখেছিলেন ক্যাপ্টেন সুরজমল এবং তাঁর জনা পঞ্চাশেক সৈনিক। সেপ্টেম্বরে নেতাজি যখন রিট্রিটের অর্ডার দিলেন সমস্ত ব্যাটালিয়নকে, তখন সুরজমল এবং তাঁর সৈনিকেরা বলেছিলেন, এই আদেশ নেতাজির হতে পারে না। শেষে নিশ্চিত হবার পর ফিরে এসেছিলেন রেঙ্গুন।

সেই মুদকের ধারেকাছে মিয়ানমারের পথে যাওয়া আজ সম্ভব নয় জানা ছিল। ইচ্ছে ছিল নিদেনপক্ষে মেজর রাতুরি এবং সুরজমলের ঘাঁটি চিয়াউকটো যাবার। কিন্তু রাখাইনের বর্তমান পরিস্থিতি আমার পরিকল্পনার পরিপন্থী ছিল। তাই ইয়াঙ্গন থেকে জিয়াওয়াদি হয়ে আমি এগিয়েছিলাম আজাদ হিন্দের অ্যাডভান্সড হেড কোয়ার্টার মেইমিওর পথে। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই বাস নামিয়ে দিয়েছিল মান্দালয়ে।

১৩

মান্দালয় থেকে শান প্রদেশের লাশিও শহরের দিকে যাবার চটজলদি উপায় ট্যাক্সি সার্ভিস। ট্রেন একটা চলে বটে, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা হওয়ায় তাতে সময় লাগে অনেক। আমার গন্তব্য ছিল মেইমিও। বর্মা সীমান্তে আজাদ হিন্দের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনোর সময় জাপান এবং ভারত, উভয়পক্ষের সেনা হেড কোয়ার্টার রেঙ্গুন থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল এই মেইমিও শহরে। জাপানি পঞ্চদশ আর্মির জেনারেল রেনিয়া মুতাগুচি আগেই এসে গেছিলেন। ৭ এপ্রিল ১৯৪৪, নেতাজিও এসে পৌঁছেছিলেন এই পাহাড়ি শহরে। তার মাত্র সাতদিন পরেই খবর এসেছিল সুভাষ ব্রিগেডের বাহাদুর গ্রুপের কর্নেল মালিক মোইরাং-এ আজাদ হিন্দের পতাকা তুলেছেন। ইম্ফল স্বাধীন হয়েছে।

চারজন যাত্রী হতেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। শেয়ার ট্যাক্সিতে ৬৭ কিলোমিটার পথ পেরতে লেগেছিল ঘণ্টা দেড়েক এবং ভাড়া সাত হাজার চিয়াট। ভোরের আলো ফোটার একটু পরেই পৌঁছেছিলাম মেইমিও শহরে, যার আধুনিক নাম 'পিন ও লুইন'। প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় শান হাইল্যান্ডের পশ্চিম প্রান্তের এই শহর একসময় গড়ে তুলেছিল ব্রিটিশরা। মান্দালয়ের দুঃসহ গরম এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব থেকে পালানোর জন্যই অনেকটা হিল স্টেশনের ধাঁচে তারা সাজিয়ে তুলেছিল মেইমিও শহর। শিমলা এবং দার্জিলিংয়ের মতোই, মেইমিও হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের গ্রীষ্ম আবাস। মেইমিও নামটা আসলে এসেছিল জনৈক কর্নেল মে-র নাম থেকে। মে-মিও নামের আক্ষরিক অর্থ মে-র নগর। প্রসঙ্গত, এই কর্নেল মে-ই ১৮৫৭-য় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই একটা নরম ঠান্ডা হাওয়া মওলামাইন, ইয়াঙ্গন, জিয়াওয়াদির অসহ্য গরমের স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়ি ঢালে কফির চাষ সেই ভাল লাগা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে বাংলোবাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, পাহাড়ি পথ, পাইনের সারি— সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল মিয়ানমারে নয়, আমি অন্য কোনও দেশে এসে পড়েছি। সস্তায় থাকার জায়গা খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। শহরের একপ্রান্তে 'থা হা জার তা' নামের এক বিচিত্র হস্টেল পছন্দ হয়েছিল। আলাপ হয়েছিল হস্টেলের মালিক থান উ-র সঙ্গে। মেইমিওর কলোনিয়াল সময়ের পাড়াগুলোয় কিছু পুরনো বাড়ি আমি খুঁজছি শুনে উনি বলেছিলেন, পরদিন আমাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাবেন। একটা সাইকেল দিয়ে বলেছিলেন, আজ এই দিয়েই কাজ চালান। ইয়াঙ্গন, জিয়াওয়াদির মতো মেইমিওতে আজাদ হিন্দ সম্পর্কিত কোনও মানুষের সঙ্গে আগাম কোনও যোগাযোগ আমার ছিল না। ইয়াঙ্গনের ভারতীয় দূতাবাস এবং পথে দেখা হওয়া প্রাক্তন ফৌজিরা কেউই মেইমিওর কোনও ভেটেরানের খবর আমাকে দিতে পারেননি। তাই থান উ-র দেওয়া সাইকেলে চেপে রাস্তায় বেরতেই একটা নতুন চ্যালেঞ্জ আমার সামনে দেখা দিয়েছিল।

মন বলছিল, যে শহরে একসময় আজাদ হিন্দের অ্যাডভান্সড হেড কোয়ার্টার ছিল, সেখানে কি একজনও প্রাক্তন ফৌজি পাব না? সাইকেলের সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। অতীতেও দেখেছি প্যাডেলে চাপ দিলেই মনের সংশয় কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মন বলেছিল, প্রথমেই যাওয়া যাক শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। পুরনো দোকানপাট সবই তো সেখানেই হবে! তার মধ্যে একটা না একটা ভারতীয় দোকান পেতেই হবে। মেইমিও ছোট্ট শহর, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে

গিয়েছিলাম ডাউনটাউনের তিন রাস্তার মোড়ে। একটা পুরনো মসজিদ এবং ১৯৩৪-এ তৈরি একটা ঘড়িঘর সেখানে দাঁড়িয়ে। মন বলছিল, 'যেখানে দেখিবে ছাই' থিয়োরি অবলম্বন করতে। দ্বিধা না করে ঘড়িঘরের একেবারে পায়ের তলায় একটা দরজির দোকানে ঢুকে পড়েছিলাম। আমার অনুমান সঠিক প্রমাণ হয়েছিল। দোকানটি ছিল এক ভারতীয়ের।

আচমকা এক আগন্তুককে দেখে দোকানের লোকজন আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। আমার বিচিত্র প্রশ্ন তাঁদের আরও অবাক করেছিল। বলেছিলাম, পুরনোদিনের গল্প খুঁজতে আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। এখানে আমি বয়স্ক মানুষজন খুঁজছি, তবে বয়স কম করে চুরাশি-পঁচাশি হতে হবে; তার থেকেও বেশি হলে আরও ভাল। টেলার মাস্টার কিছুক্ষণ ভেবে, মাথা চুলকে বলেছিলেন, আপনি ক্লাসিক ফ্যাশন দোকানের উলটোদিকের ফুটপাথে যে ইলেকট্রনিক্সের দোকানটা আছে, সেখানে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। মাস্টারসাহেবের নির্দেশমতো খুঁজে পেয়েছিলাম সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স। উঁকিঝুঁকি দিতেই বেরিয়ে এসেছিলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। ভারত থেকে আসছি শুনেই আমাকে ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়েছিলেন। নাম বলেছিলেন মহম্মদ আসলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনে হাজির হয়েছিল চায়ের কাপ। আসলামচাচা বলেছিলেন, আমার বাপ-দাদা হিন্দুস্তান থেকেই এখানে এসেছিলেন। তোমার মধ্যে যে যে রক্ত বইছে, আমারও তাই। এক হি খুন! বলো ভাই, কী সাহায্য লাগবে তোমার?

১৪

মেইমিওর বাজারে ভারতীয় দোকানে বয়স্ক মানুষ খুঁজে বেড়ানোর পদ্ধতি আমাকে এনে ফেলেছিল আসলামচাচার বাড়ি। বেশ কয়েক পুরুষ আগে উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ থেকে বর্মায় এলেও আসলামচাচার উর্দুতে একটা পরিচিত উষ্ণতা ছিল। আন্তরিকতা না থাকলে এমন উষ্ণতা মানবিক সম্পর্কে তৈরি হয় না, তাও আবার এক আগন্তুকের সঙ্গে। আমার প্রোজেক্টের ব্যাপারে শুনেই বলেছিলেন, বলো, আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি? তোমার কি কিছু টাকাপয়সা লাগবে? যদি বলো, আমরা মসজিদে বলে তোমার জন্য কিছু চাঁদা তুলে দিচ্ছি। এত ভাল একটা কাজ করছ তুমি, আজ আমার আব্বাজান থাকলে তোমাকে কিছুই ভাবতে হত না। বিরাট ব্যাবসা ছিল আমাদের। মিলিটারি শাসনের পর আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল সরকার। বেশিরভাগ মানুষই সেই সময় বর্মা ছেড়ে পালিয়েছিল। আমাদের ইন্ডিয়ার আত্মীয়রাও সেসময় বলেছিল ফৈজাবাদে ফিরে আসতে, কিন্তু আব্বাজান রাজি হননি।

বুঝতে পেরেছিলাম, আমার 'যেখানে দেখিবে ছাই' পদ্ধতি সফল। আসলামচাচার মধ্যে সেই অমূল্য রতন আমি খুঁজে পেয়ে গেছি। বলেছিলাম, সাহায্য আমার লাগবে চাচা, এবং আপনার সাহায্য আমি নেবই। তবে টাকাপয়সা নয়, এই সাহায্য হবে অন্যরকম। এক, আপনাকে এই শহরে এমন মানুষ আমার জন্য খুঁজে দিতে হবে যিনি নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে জানেন। দুই, আমাকে আপনার বাড়িতে আগামী দিনদুয়েক খাওয়াতে হবে। আমার কথা শেষ হতেই হা-হা করে হেসেছিলেন চাচা। বলেছিলেন, এ তো বিলকুল আসান ব্যাপার। এক, একটু পরেই আমার বড়ে ভাইসাব আসবেন এখানে। নেতাজির কাজ সেখান

থেকেই শুরু হবে। আর দুই, খাওয়াদাওয়া এখন থেকেই শুরু হোক। কী খাবে বলো? পরোটা চলবে? চায়ের সঙ্গে কিন্তু মন্দ লাগবে না! কিছুক্ষণ পরেই, মিয়ানমারের শান প্রদেশের এক ছোট্ট হিল স্টেশনের এক ততোধিক ছোট ঘরে আসলামচাচার সঙ্গে বসে চায়ে ডুবিয়ে পরোটা খাচ্ছিল তার হিন্দুস্তানি ভাই। কয়েক মিনিট আগেও এই চাচা-ভাতিজা পরস্পরকে চিনত না। তখন মনে হয়েছিল, জীবনের ভাল মুহূর্তগুলি যদি স্লো মোশনে, একটা ইনফিনিট লুপে রেখে দেওয়া যেত, তা হলে বেশ হত!

পরোটা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকেছিলেন আসলামচাচার বড়ে ভাইসাহাব— মহম্মদ হানিফ। আসলামচাচা সব বুঝিয়ে বলতেই হানিফজি বলেছিলেন, আরে আমি নিজেই তো একজন বালক সেনা ছিলাম। আজ যেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন তার কাছেই ছিল আজাদ হিন্দের ক্যাম্প। সেসময় মেইমিওতে যত ভারতীয় ছিল প্রায় সবাই জড়িয়ে পড়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজে। বাচ্চা-বুড়ো কেউ বাকি ছিল না। যুদ্ধের সময় স্কুল বন্ধ, তাই আমরা তো সবাই দিনরাত খেলা আর দুষ্টুমি করে বেড়াতাম। ফৌজের সৈনিকেরা আসার পরে আমাদের সেসব বন্ধ হয়ে গেল। সকালে ব্যায়াম, তারপর ফল-ইন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন, তারপর একটু পড়াশুনা। বিকেলে অবশ্য জওয়ানদের সঙ্গেই খেলাধুলা হত। একবার নেতাজি এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে। সেদিন নেতাজি কী বলেছিলেন আজ আর মনে নেই। তবে নেতাজি চলে যাবার পর আমাদের গরম পকোড়া খেতে দেওয়া হয়েছিল। সেই স্বাদ আজও মনে আছে। হাসির ঢেউ বয়ে গেছিল আসলামচাচার ঘরে। কথায় কথায় হানিফচাচা বলেছিলেন, সেসময় রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট দেখভাল করতেন এখানকার বেস হসপিটাল।

আমার মনে পড়েছিল, মেইমিও হাসপাতালে নেতাজির পরিদর্শনে আসার এক ঘটনা। ১৯৪৪-এর অক্টোবর মাস, নেতাজি ঘুরে দেখছিলেন মেইমিওর বেস হাসপাতাল। হাসপাতালে সেসময় প্রায় ২০০০ রোগী, যাঁদের অধিকাংশের শরীরেই বন্দুকের গুলির ক্ষত। বাকিদের হয় ম্যালেরিয়া, কিংবা ডিসেন্ট্রি, অথবা বেরিবেরি। ঝাঁসি রেজিমেন্টের এক রানি, ষোলো বছরের বেলা দত্ত একা দেখভাল করছিলেন পঁচাশিজন রুগির। বাঙালি মেয়ে বেলা একা হাতে এই পঁচাশিজনের জামাকাপড় কাচতেন, স্নান করাতেন এবং ওষুধ-পথ্য খাওয়াতেন। নেতাজি তাঁর স্বভাবমতোই সেদিন প্রত্যেক রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে কথা বলছিলেন। শাহনওয়াজ খান পাশেই ছিলেন। রোগীরা সবাই নেতাজিকে বলেছিলেন, বেলা দত্ত তাঁদের সকলের মায়ের থেকেও বেশি খেয়াল রাখে। সেই মুহূর্তে নেতাজির দু'চোখ জলে ভরে উঠতে দেখেছিলেন শাহনওয়াজ। বেলা দত্তের ওয়ার্ড পরিদর্শন শেষে নেতাজি গিয়েছিলেন বেরিবেরি আক্রান্ত এক রোগীর কাছে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী, ভাল হতে আর কতদিন লাগবে আপনার? অসুস্থ সেই সৈনিক জবাব দিয়েছিল, নেতাজি, আপনি হুকুম করলে এখনই আমি ফ্রন্টে যেতে প্রস্তুত! ওষুধপত্রের হাহাকার ছিল, রোজ ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণ ছিল; তবু রোগী এবং রানি নার্সদের মনোবল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন নেতাজি। সেদিন নেতাজির আদেশে হাসপাতালের রুগিদের জন্য ঢালাও জিলিপির ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর থেকেই হাসপাতালে নেতাজির নাম হয়েছিল 'জলেবি ডক্টর'।

ঝাঁসি বাহিনীর রানিদের দেশপ্রেম এবং সাহসিকতার স্মৃতিবিজড়িত হাসপাতাল আজও রয়েছে মেইমিওতে। সেটা খুঁজে বার করা কঠিন হবে না তা জানা ছিল, কারণ, সেদিনের বেস হাসপাতালই আজ মেইমিওর জেনারেল হাসপাতাল। তবে মেইমিওতে আমার মূল লক্ষ্য ছিল দুটি পুরনো বাড়ি খুঁজে বার করা। প্রথমটি হল, নেতাজির বাংলো এবং দ্বিতীয়টি হল জাপানি ফিফটিনথ আর্মির হেড অফিস। এক জাপানি তথ্যচিত্রে একঝলক দেখানো হয়েছিল এই বাড়িটিকে। সেই তথ্যচিত্রেই দেখা গিয়েছিল, নেতাজি গাড়ি থেকে নামছেন এবং তারপর জাপানি জেনারেলদের সঙ্গে যুদ্ধের আলোচনায় বসছেন। সেই ভিডিয়ো ক্লিপে একঝলক ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকেও দেখা গিয়েছিল। আমার কাছে তাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই দুটি বাড়ি খুঁজে বার করা।

হানিফচাচাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখানে নেতাজির বাড়ি কোথায় ছিল বলতে পারবেন? জবাব দিতে একমুহূর্তও ভাবতে হয়নি হানিফচাচাকে। বলেছিলেন, কানদলে লেকের পাশ দিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে কিছুটা যাবার পর দেখবে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা একটু উপর দিকে উঠে গেছে। ওই রাস্তায় একটু গেলেই বাড়িটা ছিল। তবে বহু বছর হয়ে গেল আমি ওইদিকে যাইনি। জানি না এখনও সেই বাড়ি আছে কি না! তুমি গিয়ে একবার দেখতে পারো। তবে তোমাকে ভিতরে ঢুকতে বোধহয় দেবে না। কিন্তু জাপানিদের হেড অফিস কোনটা ছিল তা আমি ঠিক বলতে পারব না। মহম্মদ হানিফ, আসলামচাচাকে বলেছিলেন, এক কাজ করো, তুমি এঁকে ক্যাপ্টেন শর্মার কাছে নিয়ে যাও। আমার থেকে উনি অনেক সিনিয়র এবং তার থেকেও বড় কথা হল, উনি শিক্ষিত মানুষ। কিছু না কিছু জানবেন নেতাজি এবং মেইমিওর ইতিহাসের ব্যাপারে।

মেইমিওর বাজারে চাচা-ভাতিজা বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার কাঁধে মৃদু ভর দিয়ে আসলামচাচা হাঁটছিলেন। বলছিলেন, একাশি বছর বয়স হয়ে গেল, হাঁটুতে আর আগের মতো জোর পাই না রাজাভাই। মিলিটারি শাসনের প্রথমদিকে একবার নাফ নদী সাঁতরে পার হয়ে মণিপুরের দিকে গিয়েছিলাম। আসলামচাচার রক্তে অ্যাডভেঞ্চার রয়েছে বুঝতে পারছিলাম। তা না হলে কখনও হুট করে আমার মতো একজন অজ্ঞাত বিদেশিকে এভাবে কাছে টেনে নেওয়া যায়? তার ওপর দেশটা যখন মিয়ানমার। গলি দিয়ে যেতে যেতে আমাকে একরকম গাইডেড ট্যুর করাচ্ছিলেন চাচা। বলছিলেন, এই হল আমাদের গণেশমন্দির, দিওয়ালি আর হোলির সময় এখানে একসময় খুব ধুমধাম হত। এই হল মিওমা সিনেমা, একসময় খুব রমরমা ছিল। আমি দেখছিলাম মিওমা সিনেমার ফ্যাসাড অনেকটাই আমাদের কলকাতার মেট্রো সিনেমার মতো। চাচা বলছিলেন, মিলিটারি শাসনে সরকার নিয়ে নিয়েছিল মালিকের কাছ থেকে। সেই থেকে পড়ে আছে। এখন আবার সারাই চলছে। মনে হচ্ছে এবার কিছু একটা হবে এখানে। পারসেল টাওয়ারের রাস্তা এবং মান্দালয় যাবার রাস্তা পার হয়ে ঢুকেছিলাম একটি ছোট কাঁচা রাস্তায়। রাস্তার নাম— গুর্খা রোড। রাস্তার নাম দেখে অবাক হইনি। আমি জানতাম ব্রিটিশ আমলের অনেক আগে থেকেই, ভারতীয়দের মতোই, একটা বড় সংখ্যার নেপালি অভিবাসন হয়েছিল বর্মায়। গুর্খারা অবশ্য মূলত এসেছিল ব্রিটিশ-গুর্খা রেজিমেন্টের হাত ধরে।

ইতিমধ্যে, তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা টিনের চাল ছাওয়া কাঠের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা। দরজা বন্ধ ছিল তাই রাস্তা থেকেই 'ক্যাপ্টেন সাব-ক্যাপ্টেন সাব' করে ডাকতে আরম্ভ করেছিলেন আসলামচাচা। দরমার দরজা খুলে একটু পর বেরিয়ে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন শর্মা, পরনে একটা খাকি জ্যাকেট,

মাথায় ব্রিটিশ ফ্ল্যাট হ্যাট। আসলামচাচা আমার পরিচয় এবং মেইমিও আসার উদ্দেশ্য জানাতেই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটেছিল। চাচা-ভাতিজাকে একেবারে হতবাক করে দিয়ে ক্যাপ্টেন ডি আর শর্মা বলেছিলেন, আমি নিজেই ছিলাম আজাদ হিন্দের প্রোপাগান্ডা ইউনিটে। রেঙ্গুনে আমাদের ট্রেনিং হয়েছিল। ভারতের ইতিহাস, পলিটিকাল সায়েন্স পড়তে হত, গুপ্তচরের কাজ শেখার পাশাপাশি। কানবে, থিংগ্যাঙ্গুন, কামায়ুত— এইসব জায়গায় নেতাজির বক্তৃতাও আমি শুনেছি। রেঙ্গুনে ট্রেনিং-এর পর মেইমিওতে কিছুদিন ছিলাম। তারপর আরাকান সীমান্তে আমাদের পাঠানো হয়েছিল। ফৌজ ঢোকার কয়েকদিন পর আমরা শহর-গ্রামগুলোতে পৌঁছতাম। আমাদের কাজ ছিল সাধারণ মানুষকে বোঝানো যে আমরা ভারতবর্ষ স্বাধীন করার জন্য লড়ছি। বর্মার মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। তা ছাড়া, বহুবার ফৌজের সঙ্গে যৌথ অপারেশনেও আমাদের জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। মণিপুর থেকে রিট্রিটের পর যখন ব্রিটিশরা ধরপাকড় চালাচ্ছিল, তখন আমি গা-ঢাকা দিয়েছিলাম রেঙ্গুনে। পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হবার পর বহুকষ্টে এসে পৌঁছেছিলাম মেইমিও। আমার উত্তেজনার অন্ত ছিল না। আমার সামনে বসে আরাকানের জঙ্গলে আজাদ হিন্দের অপারেশনের গল্প বলছিলেন নেতাজির এক সিক্রেট এজেন্ট!

১৬

বেরিয়ে আসার আগে ক্যাপ্টেন শর্মাকেও নেতাজির বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম। ক্যাপ্টেন শর্মার বিবরণ হুবহু মিলে গিয়েছিল হানিফচাচার সঙ্গে। আসলামচাচা এবং ক্যাপ্টেন শর্মাকে বিদায় জানিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম সেই বাড়ির সন্ধানে। গুগল ম্যাপে কানদলে লেক খুঁজে বার করা সহজ ছিল। লেকের কাছে আসতেই দেখেছিলাম রাস্তা দু'ভাগ হয়েছে। বড় রাস্তা চলে গিয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে, আর একটা সরু, কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছিল একটা টিলার মাথায়। হানিফচাচা এবং ক্যাপ্টেন শর্মা যে এই রাস্তার কথাই বলছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। একটু যেতেই বাঁদিকে এক বিশাল বাগানবাড়ি দেখা দিয়েছিল। কোনও রক্ষণাবেক্ষণ না থাকায় বাগান ঝোপজঙ্গলে ভরে ছিল। সাইকেল ঠেলে বাংলোচত্বরে ঢুকে পড়েছিলাম। বাধা দিলে বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ! দু'পা এগোতেই দেখা দিয়েছিল দোতলা বাংলো। গাড়িবারান্দার নীচে সাইকেল রেখে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু করেছিলাম। দেখেছিলাম বাংলো একেবারেই ভগ্নদশায় হলেও পরিত্যক্ত নয়। একটা সাইনবোর্ড দেখে মনে হয়েছিল সরকারি কিছু একটা দফতর এখানে থাকলেও থাকতে পারে। ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা বার করতে যাব এমন সময় কোথা থেকে এক ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছিলেন। পুরনো বাড়ি খুব ভাল লাগে আমার— এই কথা বোঝাতে গুগল ট্রান্সলেট পরিত্রাতা হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভদ্রলোক বেশ ভদ্রভাবেই বলেছিলেন, এটা এখন মেইমিওর ট্র্যাফিক পুলিশ অফিস। অতএব বাড়ির ভিতরের কোনও ছবি তোলা যাবে না। আর দোতলায় ওঠার প্রশ্ন তো নৈব নৈব চ। বাড়ির বাইরে থেকেই আশ মিটিয়ে ছবি তুলে চলে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল আগামী বছরে এই বাড়ি আর থাকবে কি না সন্দেহ! মিয়ানমারের সব শহরেই যে হারে পুরনো বাড়ি ভাঙার হিড়িক দেখেছিলাম গত কয়েকদিনে, তাতে ভরসার বদলে ভয়ই ছিল বেশি।

নেতাজির বাড়ি দেখে কানদলে স্ট্রিট ছেড়ে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়েছিলাম। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। জানলায় দেখা দিয়েছিল বিদেশি মুখ। হালকা ঠান্ডার আমেজ, পাইনের সরণি, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জীর্ণ কলোনিয়াল আমলের বাংলোবাড়ি— সব মিলিয়ে একটা বিষাদ-মধুর নস্টালজিয়া তৈরি হয়েছিল আমার মনে। জাপানি হোটেল আকিমোমি ছাড়িয়ে, ডানদিকের মোরাম ঢাকা পথে ঢুকে পড়েছিলাম। উঁচু পাঁচিলের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে দেখা দিয়েছিল মেইমিওর বিখ্যাত হোটেল ক্যান্ডাক্রেইগ। ১৯০৬-এ তৈরি এই হোটেলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জর্জ অরওয়েল এবং পল থেরু-র স্মৃতি। পল থেরুর *দি গ্রেট রেলওয়ে বাজার* বইতে এই হোটেল এবং মেইমিওর খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। খুব ইচ্ছে ছিল একবার হোটেলের ভিতরে যাবার, কিন্তু দেখেছিলাম ক্যান্ডাক্রেইগ বন্ধ। 'থিরি মাইং' নাম দিয়ে নতুন করে সেই হোটেলকে চালু করার চেষ্টা চলছে। ভাবছিলাম, ৫ এপ্রিল ১৯৪২, এর কাছাকাছিই কোথাও জেনারেল স্টিলওয়েলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন চিয়াং কাই শেক। চিয়াং কাই শেকের পঞ্চাশ হাজার সৈনিক যোগ দিয়েছিল ব্রিটিশের পক্ষে। তার কয়েক মাসের মধ্যেই অবশ্য চিন এবং ব্রিটিশের যৌথবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল জাপানি সেনার আক্রমণ। আমার মনে হয়েছিল, সন্ধে নামার আগে জাপানি ফিফটিনথ আর্মির হেড কোয়ার্টারটা এবার খোঁজার সময় হয়েছে। সেই বাড়ি খোঁজার একমাত্র সূত্র ছিল জাপান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের একটি তথ্যচিত্র। তথ্যচিত্রে কয়েক মুহূর্তের জন্য আসা এক ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা গিয়েছিল হেড কোয়ার্টারের চেহারা। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো হলেও সহজে হাল ছাড়তে মন চাইছিল না। একমাত্র উপায় ছিল আসলামচাচা এবং ক্যাপ্টেন শর্মার পুনরায় শরণাপন্ন হওয়া।

পরদিন সকালে আমার ল্যাপটপে রাখা তথ্যচিত্রের সেই দৃশ্য দেখিয়েছিলাম আমার দুই উপকারী বন্ধুকে। একাধিকবার রিপ্লে করে দেখার পর দু'জনেই একমত হয়েছিলেন যে এই তথ্যচিত্রে দেখা বাড়িটি আজও আছে মেইমিওতে। মোটামুটিভাবে পথনির্দেশ বুঝে নিয়েই আবার বসেছিলাম সাইকেলে। জেনারেল হাসপাতাল ছাড়িয়ে একটু এগোতেই আমার বাঁ-হাতে দেখা দিয়েছিল জাপানি তথ্যচিত্রে দেখা সেই ঐতিহাসিক বাড়ি। বিশাল সাইনবোর্ড বলে দিচ্ছিল সরকারি কোনও গুরুত্বপূর্ণ অফিস রয়েছে আজ এখানে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের অনুমতি নিয়ে ছবি তুলেছিলাম বাড়ির বাইরে এবং ভিতরে। একজন বলেছিলেন, এটা এখন মিয়ানমারের গৃহমন্ত্রকের একটি অফিস। দিনের শেষে হাসপাতালের চত্বরে একবার ঘুরে হস্টেল ফেরার সময় মনে হয়েছিল রানি ঝাঁসির ব্যারাক যে স্কুলবাড়িতে ছিল সেটা খুঁজে পেলেও বেশ হত! কারণ সেখানেই একবার মেইমিওতে উপস্থিত সমস্ত আজাদ হিন্দ সেনাকে ভোজ দিয়েছিলেন ঝাঁসির রানিরা। খাবার পরিবেশন করেছিলেন নেতাজি স্বয়ং। ভোজ শেষ হবার মুখে ব্রিটিশ বিমান শুরু করেছিল বোমাবর্ষণ।

১৭

নেতাজির বাড়ি এবং জাপানি ফিফটিনথ আর্মির হেড কোয়ার্টার্স দেখে হস্টেলে ফিরতেই দেখা হয়েছিল থান উ-র সঙ্গে। একগাল হেসে থান উ বলেছিলেন, কী ব্যাপার, আপনি তো দেখছি সাইকেলেই সব চষে ফেলছেন। দু'দিন ধরে আপনার দেখাই পাচ্ছি না। আমি যে আপনাকে একদিন আমাদের শহর ঘুরিয়ে দেখাব বলেছিলাম তার কী হবে? টুরিস্টদের মতো সাইট সিয়িং-এ আমার আগ্রহ ছিল না এটা ভদ্রলোক জানতেন।

তাই বলেছিলেন, বলুন কী দেখতে চান, আমি সেটাই দেখাব আগামীকাল সকালে। মেইমিওর কফি চাষের ব্যাপারে আমার কৌতূহলের কথা জানাতেই, থান উ বলেছিলেন, আমার এক বন্ধুরই এখানে কফি ফার্ম। চলুন কাল সকালেই আমরা একবার ঘুরে আসব ওর ফার্ম থেকে। পরদিন সকালে কেবল থান উ-র বন্ধুর ফার্ম নয়, তার পাশের কয়েকটা কফি ফার্মও ঘুরে নিয়েছিলাম আমরা। একটি ফার্মে প্লান্টেশনের মধ্যে ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে, নানারকম কফির স্বাদ এবং গন্ধে মজে থাকার পর আবার বাস্তবে ফিরেছিলাম। মিয়ানমারে প্রায় দুশো বছর ধরে কফির চাষ হলেও কফির সংস্কৃতি এবং তার বাণিজ্যিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে ২০১৬ থেকে। এই অল্পসময়েই আন্তর্জাতিক বাজারে তার নিজস্ব একটা সুনাম তৈরি হয়ে গেছে। মেইমিওর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। শেষবারের মতো আসলামচাচা এবং ক্যাপ্টেন শর্মাকে বিদায় জানিয়ে উঠেছিলাম মান্দালয়গামী শেয়ার ট্যাক্সিতে।

মান্দালয়ের গনগনে রোদ আর ধুলো, মেইমিওর স্বর্গবাসকে এক লহমায় বাস্তবের মাটিতে আছড়ে ফেলেছিল। দুঃসহ গরমে পিঠে রুকস্যাক নিয়ে হাঁটছিলাম হস্টেলের খোঁজে। রাজপ্রাসাদের উঁচু পাঁচিল, তাকে ঘিরে রাখা প্রশস্ত পরিখা, গলির মুখ থেকে উঁকি মারা মন্দিরের গোপুরম, দুর্গের মতো ঘিরে রাখা মসজিদ আর সোনা রঙের বৌদ্ধ প্যাগোডার মিছিল সরে যাচ্ছিল আবছায়া মরীচিকার মতো। ভাবার চেষ্টা করছিলাম, ১৮৮৫-তে, এখানেই বর্মার শেষ স্বাধীন রাজা থিব হার মেনেছিলেন ব্রিটিশের কাছে। ব্রিটিশ সৈন্য অবাধে লুঠ চালিয়েছিল রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে। তারপর এই প্রাসাদেরই এক অংশে বানিয়েছিল এক পাশবিক জেলখানা। সেই জেলেই ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ বন্দি ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। এই জেলে বসেই তিলক তাঁর *গীতার* ভাষ্য লিখেছিলেন। এদিকে ১৯২৪-এ কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে মারার ব্যর্থ চেষ্টার পর গোপীনাথ সাহাকে জেলের মধ্যেই ফাঁসি দিয়ে দাহ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসক। মৃতের জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় গোপীনাথের ভাইয়ের সঙ্গে জেলের গেটের সামনে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছিলেন তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপালিটির কর্মাধ্যক্ষ তরুণ সুভাষচন্দ্র। কলকাতা তখন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। লন্ডনের পরেই ছিল তার অবস্থান। সেই কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের মতো আপসবিহীন নেতার উত্থানে এমনিতেই আতঙ্কিত ছিল ব্রিটিশ। এই পরিস্থিতিতে গোপীনাথ সাহার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করাকে কেন্দ্র করেই ২৫ অক্টোবর ১৯২৪-এ গ্রেফতার হয়েছিলেন সুভাষ। প্রথমে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। তারপর কিছুদিন বহরমপুর জেলে রাখার পর, কলকাতা থেকে চারদিন জাহাজপথে নিয়ে আসা হয়েছিল রেঙ্গুন। রেঙ্গুন থেকে মান্দালয়, এই বিশেষ বন্দিকে আনা হয়েছিল কুড়ি ঘণ্টার এক ট্রেনযাত্রায়। আমার ভেবে হাসি পেয়েছিল এই ভেবে যে, ১৯২৪-এ যে ট্রেনজার্নি কুড়ি ঘণ্টায় হত, আজ ২০১৯-এও তা অপরিবর্তিত। এই হল সময় থমকে থাকার এক জলজ্যান্ত প্রমাণ। মান্দালয় স্টেশনটা অবশ্য নতুন করে বানানো হয়েছে। স্টেশনবাড়ির ওপরটায় আজ একটা বড়সড় হোটেল। হোটেলের সাইনবোর্ড দেখে সেই বাড়ি স্টেশন, না হোটেল, তা বোঝা কঠিন।

মান্দালয়ের জেলের সেই দু'-তিন বছর সুভাষের মধ্যে এক বিপুল পরিবর্তন এনেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্রণী সেনাপতি থেকে তাঁর উত্তরণ হয়েছিল এক পরিণত জননায়কে। হস্টেলে আমার জিনিসপত্র রেখেই ছুটেছিলাম রাজপ্রাসাদের ভিতর অবস্থিত সেই কুখ্যাত জেলের খোঁজে। মান্দালয়

রাজপ্রাসাদের একমাত্র পূর্বদিকের দরজা দিয়েই বিদেশিদের ঢুকতে দেওয়া হয়। দশ হাজার চিয়াট, অর্থাৎ পাঁচশো টাকার টিকিট কেটে প্রাসাদে ঢোকার সময় পাসপোর্ট জমা রাখতে হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীর অফিসে। প্রাসাদের দেওয়ালে ঝুলছিল এক বিশাল ব্যানার। তাতে যা লেখা ছিল তার মর্মার্থ হল: 'তাতমাদ এবং জনগণের সহযোগিতায় দেশের সব শত্রু ধ্বংস হয়।' 'তাতমাদ'(Tatmadaw) হল মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর পোশাকি নাম। প্রাসাদের চত্বরে ঢুকতেই বুঝেছিলাম সবটাই এই 'তাতমাদ'-এর নিয়ন্ত্রণে। রাজপ্রাসাদের গলিঘুঁজি ঘুরেও যখন ঐতিহাসিক জেলখানার কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি, তখন মনে হয়েছিল নেতাজির কথা ঐতিহাসিকভাবে ভুলে থাকা না হয় চিরকালই ভারতের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল, তাই বলে বালগঙ্গাধর তিলকও যেখানে কারাবাস করেছিলেন সেখানে একটা স্মৃতিফলক রাখার অনুরোধও কি ভারত সরকার আউং সান সু চি-কে করতে পারেন না?

১৮

জাপানিদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে ব্রিটিশ সেনা তড়িঘড়ি ভারতের দিকে পালানোর পর, ১ আগস্ট ১৯৪৩, বর্মা তার প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। স্বাধীন বর্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী বা ম-কে নেতাজি বলেছিলেন, মান্দালয় জেলের বারান্দা থেকে দিনের পর দিন আমি তাকিয়ে থাকতাম বর্মার শেষ সম্রাটের প্রাসাদের দিকে, আর ভাবতাম কবে এই দেশ আবার স্বাধীন হবে? আজ আমি সেই মুক্ত বর্মার বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিচ্ছি। আজাদ হিন্দ সরকারের কোষাগার থেকে দেশগঠনের জন্য বা ম-র হাতে নেতাজি তুলে দিয়েছিলেন সেসময়ের আড়াই লক্ষ টাকা। বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বর্মার সহযোগিতার জন্য এটুকু আমাদের নজরানা। অক্টোবর ১৯৪৪, এই মান্দালয় থাকাকালীনই নেতাজি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন টোকিও থেকে। জাপানের শীর্ষ নেতৃত্ব সেসময় কেবল ভারত নয়, জাপানের নিজস্ব বিদেশ নীতি নিয়েও নেতাজির পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মান্দালয় থেকে রেঙ্গুনে পৌঁছে প্রথমেই নেতাজি যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের ক্যাবিনেটের সঙ্গে। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, পরবর্তী পদক্ষেপ এবং আক্রমণ পদ্ধতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর চলে গিয়েছিলেন টোকিও। টোকিওর মিটিং সেরেই আবার সরাসরি ফিরে এসেছিলেন ফ্রন্টে।

মান্দালয় জেলও বহু ঘটনার সাক্ষী। এই জেলে থাকাকালীনই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন সুভাষ। প্রথমে ভীষণভাবে ভেঙে পড়লেও, আঘাত সামলে নিয়ে সংকল্প করেছিলেন দেশবন্ধুর জীবনী রচনার। ১৯২১-২২-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধুর সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন সুভাষ। সেই ছিল তাঁর প্রথম কারাবাস। এরপর ব্রিটিশ সরকার মোট এগারোবার জেলখানায় পুরেছিল নেতাজিকে। যাই হোক, এই প্রথম কারাবাসের সময়েই সুভাষকে দেখা গিয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে পিতার মতো সেবা করতে। দু'জনের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, জেলের অন্য বন্দিরা রসিকতা করে বলতেন, দেশবন্ধু জেলে একজন বিলেতফেরত 'আইসিএস রাঁধুনি' রেখেছেন। সেবারেই সুভাষ দেখেছিলেন দেশবন্ধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দর্শনের ওপর একটি বই লেখার কাজ করছেন। মান্দালয় জেল থেকে দাদা শরৎকে লেখা অগণিত চিঠির মধ্যে একটিতে সুভাষ লিখেছিলেন, ১৯২১-২২-এ জেলে বসে লেখা দেশবন্ধুর সেই নোটগুলি

পাওয়া গেলে তাকে সম্পূর্ণতা দেবার কাজ করা যেতে পারে। পশুর খাঁচার সঙ্গে তুলনীয় এই মান্দালয় জেলে বসেই সুভাষ চিত্তরঞ্জনের ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একই সঙ্গে আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস এবং বর্মার ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি নিয়েও পড়াশুনো করেছিলেন অনেক। ফেব্রুয়ারি ১৯২৬-এ মান্দালয় জেলেই সুভাষের নেতৃত্বে বন্দিরা ভুখ-হরতাল করে আদায় করে নিয়েছিল দুর্গাপুজো করার অধিকার। এই ভুখ-হরতালের শেষে কেবল দুর্গাপুজো নয়, বন্দিদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো অনেক দাবিই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল জেল কর্তৃপক্ষ। এদিকে কলকাতায়, প্রায় গোটা ১৯২৬ জুড়ে দাদা শরৎ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন নির্বাচনের। সুদূর বর্মার জেলে থাকলেও সুভাষকে প্রার্থী হিসেবে রেখেছিলেন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে। যতীন্দ্রমোহন বসুকে বিপুল ভোটে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন সুভাষ। ব্রিটিশ সরকার তাতে গলেনি। ইতিমধ্যে শরীর ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিল সুভাষের এবং ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিল সুভাষকে রেঙ্গুন জেলে সরিয়ে আনতে। জানা গিয়েছিল, মান্দালয়ের জেলে এক যক্ষ্মারোগীর কাছাকাছি দীর্ঘদিন থাকার ফলে ফুসফুসে এক জটিল সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুভাষ। তারপর একদিন, আড়াই বছর বিনা বিচারে বর্মার তিনটি পৃথক জেলে কারাবাস করার পর সুভাষ মুক্তি পেয়েছিলেন। কলকাতায় ক'দিন কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন শিলং। এই সময় সুভাষকে চিকিৎসা করে দ্রুত সারিয়ে তুলেছিলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়।

মান্দালয় জেল, রেলস্টেশন দেখা হয়ে গিয়েছিল। মান্দালয় হিলের মাথায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে গিয়ে চোখের সামনে খুলে গিয়েছিল ইরাবতী নদীর বিস্তার এবং আরও দূরের আবছায়া পাহাড়ের শ্রেণি। গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল এই ভেবে যে একদিন এই মান্দালয় সেনাছাউনি থেকেই আজাদ হিন্দের সেনাদল ইরাবতী পার হয়ে এগিয়েছিল সাগাইং, মনিওয়ার দিকে। যাত্রাপথের দুর্গমতা তাঁদের বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি। মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই তখন তাঁদের জীবনধারণের একমাত্র মন্ত্র। সন্ধে নামার পর হেঁটে বেরিয়েছিলাম মান্দালয়ের অলিগলি। উদ্দেশ্য, খুঁজে বার করা ভারতীয় পরিবার। আশা, কেউ না কেউ খোঁজ দিতে পারবেন অশীতিপর কোনও ভারতীয়ের, যিনি বলতে পারবেন পুরনো সেই দিনের কথা। আমার অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল রাস্তার ধারের খাবারের দোকান থেকে। একে একে খোঁজ পেয়েছিলাম আর্য সমাজের সুরেশ ভরদ্বাজ এবং উমাশংকর তালুকদারের। সুরেশজি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৯৩৮-এ পুনর্নির্মিত আর্য সমাজের মন্দির এবং ধর্মশালায়। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার পর দেখা দিয়েছিল প্রশস্ত সভাঘর। মেঝে ঢেকেছিল সিমেন্ট এবং পাথরের টুকরোয়। সভাঘরের এক নির্দিষ্ট বিন্দু দেখিয়ে সুরেশজি বলেছিলেন, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে একদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন নেতাজি।

১৯

মান্দালয়ের ৮৩ এবং ২৭ নম্বর রাস্তা যেখানে মিলেছে, আর্য সমাজের প্রাচীন, ভগ্নপ্রায় তিনতলা বাড়ি সেখানেই। নেতাজি যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই 'হল' দেখে সুরেশ ভরদ্বাজের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম। সুরেশজি বলেছিলেন, এই বাড়ি সারানোর চেষ্টা চলছে। এদিকে কাজ চালানোর জন্য নতুন একটি বাড়িও আমরা বানিয়ে ফেলেছি। চলো তোমাকে আমাদের সমাজের নতুন বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে আসি। আপত্তি

করার কিছুই ছিল না। বরং মনে হয়েছিল, এই সুযোগে সুরেশজির মুখ থেকে আরও কিছু মূল্যবান স্মৃতিচারণ শোনা যেতে পারে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, যুদ্ধের দিনগুলো ঠিক কীরকম ছিল সুরেশজি? সাইকেল, ঠেলাগাড়ি, অটো, শোলের মোটরবাইক স্টাইলের রিকশা, পথচারীর মুখ থেকে ছিটকে আসা পানের পিক এবং গোলাপি উর্দি পরা ভিক্ষুর মিছিলের পাশ কাটিয়ে দু'জনে হাঁটছিলাম। মান্দালয় এবং কলকাতার বড়বাজারের রাস্তার মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মনে হয়েছিল, 'বিশৃঙ্খলার মধ্যে মোক্ষ' এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বুক ফুলিয়ে চলা দেশগুলো নিয়ে যদি একটা ইউনাইটেড নেশনস গোছের আন্তর্জাতিক সংগঠন কোনওদিন গড়ে উঠত, তা হলে ভারতের পাশাপাশি, সেই সংগঠনের সাম্মানিক স্থায়ী সদস্যপদ মিয়ানমারের বাঁধা ছিল।

সুরেশজি বলছিলেন, ১৯৪০-এ মান্দালয়ে প্রথম জাপানি বোমা পড়ার পর ব্রিটিশ বিনা লড়াইয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তখন খুবই ছোট। বয়স সাত-আট হবে। তবে আমার মনে আছে, বোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তল্পিতল্পা বেঁধে প্রথমেই বাবা-মা'র সঙ্গে ট্রেনে চেপে আমরা পৌঁছেছিলাম মনিওয়া। ওখানে কিছুদিন থাকার পর পৌঁছেছিলাম কালেওয়া। কালেওয়ার পর আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সৈনিকরা। বলেছিল ভারতে ঢোকার সীমান্ত বন্ধ। আমরা একা ছিলাম না। আমাদের মতো হাজার হাজার ভারতীয় পরিবার মরিয়া হয়ে সেসময় ভারতে ফেরার চেষ্টা করছিল। কালেওয়া ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোতেই ব্রিটিশ সেনা আমাদের আটকে দিয়েছিল। বর্মার সব মুদ্রাই তখন অচল। আমার বাবার কাছে কিছু রুপোর টাকা ছিল। আমার মনে আছে, ঠিক দুশো রুপোর টাকায় একটা রফা হয়েছিল। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঘুষ চাওয়া ব্রিটিশ অফিসারদের সেসময় রীতিমতো দস্তুর ছিল। টামু, মোরে, গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি হয়ে লাহোরে আমাদের পৈতৃক ভিটায় পৌঁছতে ঠিক কতদিন লেগেছিল আজ আমার আর মনে নেই।

আর্য সমাজের নতুন বাড়ি দেখে ফেরার সময় সুরেশজি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন উমাশংকর তালুকদারবাবুর দোকানে। ৮২ নম্বর রাস্তায় ইউনিটি হোটেলের বিপরীতদিকে বিরাট দোকান উমাশংকরবাবুর। সুরেশজিকে দেখেই এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন। সুরেশজি বলেছিলেন, এবার এঁকে নেতাজির মান্দালয় দেখানোর দায়িত্ব আপনার উমাশংকরবাবু। উমাশংকরবাবু একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, অবশ্যই, আমি আপনাকে দু'জনের কাছে নিয়ে যাব। একজন জয়হিন্দবাবুর ছেলে হীরালাল, আর অন্যজন গজাধর রাই। আমাকে একটু সময় দিন আমি ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিচ্ছি। আর, যদি সময় পান, আসুন না আজ সন্ধেবেলা আমাদের দুর্গাবাড়িতে। সন্ধ্যায় আমাদের একটা মিটিং আছে। আপনি এলে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আপনার আলাপও করিয়ে দেওয়া যাবে। বলেছিলেন, ২৮ এবং ৭৫ নম্বর রাস্তার ক্রসিং-এর পরেই রাস্তার বাঁদিকে আমাদের দুর্গাবাড়ি।

অনেক দেশের মতো, আজকের মিয়ানমারে মোবাইল অ্যাপে মোটরবাইক ট্যাক্সি ডাকা যায়। চার চাকার থেকে ব্যাপারটা সস্তাও হয়। তাই একটা ঠিকানা পেয়ে গেলে সেখানে পৌঁছে যাওয়াটা সমস্যা ছিল না। কথামতো হাজিরও হয়েছিলাম মন্দিরে। মন্দিরের চত্বরে কমিটির সদস্যরা ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের আলোচনায়। মেইমিওতে আসলামচাচার বাড়িতে বসেই আবিষ্কার করেছিলাম যে মিয়ানমারে বাস করতে হলে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একটা বর্মি নাম নেওয়া বাধ্যতামূলক। মনে হয়েছিল, মিলিটারি জেনারেল এবং বৌদ্ধ শ্রমণের আঁতাত এদেশে আক্ষরিক অর্থেই অন্য ধর্মের মানুষের নাম ভুলিয়ে ছেড়েছে। এক হিন্দু পরিবারের বিবাহের

আমন্ত্রণ পত্রে দেখেছিলাম পাত্র মনোজের নাম ছাপা হয়েছে আয়ে আয়ে নাইং, আর পাত্রী দীপিকার নাম চিট উইন। ধর্মকে মরিয়াভাবে আঁকড়ে ধরে নিজেদের পরিচয় টিকিয়ে রাখার চেষ্টা আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দেখেছি। তবে এই প্রচেষ্টা সেই সব রাষ্ট্রেই প্রবল যেখানে জোর করে একটা সরকারি ধর্ম বাকি বাসিন্দাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, মানুষের ইতিহাসে জোর যার মুলুক তার— এরকম ধ্রুবসত্য খুব কমই লেখা হয়েছে। এই একই কারণে, মিয়ানমারের সমস্ত হিন্দু মন্দিরে রক্ষাকবচের মতো একটা বড়সড় বুদ্ধমূর্তি রাখা থাকে। হিন্দুদের অবশ্য এব্যাপারে একটা অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ তাঁদের দশ অবতারের একজন বলেই শিবমন্দিরে ঢোকার আগে বুদ্ধের সামনে মাথা হেঁট করতে তাঁদের খুব একটা মানসিক অসুবিধা হচ্ছে না।

২০

ইয়াঙ্গনের পর মান্দালয়েও দুর্গাবাড়ি দেখে অবাক লাগেনি। বর্মা মুলুকের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক আজকের নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলার বহু আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধর্ম, ব্যাবসা এবং রাজনীতির এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কাম্বোডিয়া এবং মালয়েশিয়ার রাজারা ভারতের চোল রাজবংশকে নিয়মিত উপঢৌকন এবং রাজস্ব পাঠাতেন। গুজরাতের মুসলিম ব্যবসায়ীরা গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূল জুড়ে তাঁদের কেনাবেচার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। মান্দালয়ের খুব কাছেই, মধ্য মিয়ানমারের বাগানের প্রাচীন মন্দিরনগরীর গায়ে আজও সংস্কৃত, পালি এবং তামিল লিপি দেখতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনটি অ্যাংলো-বার্মিজ় যুদ্ধ এবং তার পরের ব্রিটিশ রাজত্ব— ভারতীয়, বিশেষত বাঙালির প্রতি বর্মি মানুষের মন বিদ্বেষে ভরে দেয়। ১৯৩৬-এ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ভারত এবং বর্মা দুই দেশের মানুষই একই আধ্যাত্মিক আদর্শে বিশ্বাসী। হিউয়েন সাং-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সুনীতিবাবু বলেছিলেন, একদিন এই প্রোম শহর 'শ্রীক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল। ভারত এবং বর্মা তাই একে অপরের জ্ঞাতিভাই। আজ মিয়ানমারের মিলিটারি জুনটা অবশ্য সেই প্রাচীন প্রোমের নাম বদলে 'পী (PYAY)' করে দিয়েছে।

বর্মা শাসন করার জন্য ব্রিটিশরা প্রথম থেকেই শিখণ্ডীর মতো শিক্ষিত বাঙালিকে ব্যবহার করেছিল। বর্মার রেল, ব্যাংক, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, সরকারি অফিস সর্বত্র আপাত শিক্ষিত বাঙালির ছিল একচেটিয়া অধিকার। তামিল চেট্টিয়ার এবং গুজরাতি মুসলিম সমাজের হাতে ছিল সুদ এবং পণ্যের কারবার। আবার অন্যদিকে, বর্মার একটু ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার হিন্দু কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজে পড়তে আসতেন। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেই সম্ভবত মিয়ানমারের বর্তমান দেশনেত্রীর শিক্ষাজীবনের একাংশ কেটেছিল দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজে। একসময় বছরে গড়ে এক লক্ষ ভারতীয় বর্মায় কাজের সন্ধানে যেতেন। ১৯২৭-এ সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চার লক্ষ আশি হাজারে। রেঙ্গুন, মুলমিন এইসব শহরে ভারতীয়রাই ছিল সংখ্যাগুরু। দেশ শাসনের সমস্ত অপ্রিয় কাজই ব্রিটিশ সরকার করাত এই ভারতীয় তথা বাঙালি কর্মচারীদের দিয়ে। ফলে, সেই সময় থেকেই সাধারণ বর্মি মানুষের মনে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালির প্রতি একটা বিদ্বেষ জন্মাতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময় থেকেই সেই বিদ্বেষ চরম আক্রোশে পরিণত হয়। আজকের মিয়ানমারে বাংলা ভাষার আরাকানি উপভাষা বলা রোহিঙ্গাদের প্রতি নিপীড়ন এবং গণহত্যার একটা যোগসূত্র সেই প্রাচীন বাঙালি বিদ্বেষের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে। মিয়ানমারের আজকের প্রজন্মের বাঙালিরা তাই নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে একটু ইতস্ততই বোধ করেন। ইয়াঙ্গনের পর মান্দালয়েও সেটা অনুভব করেছিলাম।

দুর্গাবাড়ির মিটিং সেরে উমাশংকরবাবু বলেছিলেন, আগামীকাল সকালে আমার দোকানে চলে আসবেন। তারপর আমরা দু'জনে বেরব। ধন্যবাদ এবং বিদায় জানিয়ে আস্তানায় ফেরার পথ ধরেছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসেই মান্দালয়ের গরম হাঁফ ধরিয়ে দিচ্ছিল। একমাত্র সকাল আর সন্ধেটাই যা একটু রক্ষা ছিল। রাজপ্রাসাদের গা ঘেঁষে চওড়া ফুটপাথ ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর ফুটপাথে এক জমজমাট খাবার দোকানে রাতের আহার সেরে ঘরে ঢুকেছিলাম। পরদিন সকালে দোকানে হাজির হতেই উমাশংকরবাবু আমার হাতে একটা হেলমেট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, পুরনো মানুষ বলতে হাতে গুনে জনাদুয়েক বেঁচে আছেন এই মান্দালয়ে। গজাধর রাই সেরকমই একজন। কিছুক্ষণ পর আমাদের স্কুটি থেমেছিল ইরাবতীর পাড়ে গঙ্গাঘাট মন্দিরে। মন্দিরের পাশের একটি ছোট ঘরে একটা তক্তাপোশের ওপর গজাধর রাই বসে ছিলেন। ওঁর পায়ে তীব্র গন্ধের একটা তেল মালিশ করছিলেন সম্ভবত ওঁর স্ত্রী। আমরা যেতেই সরে গেলেন। উমাশংকরবাবুকে দেখে একটু ক্লান্ত স্বরেই গজাধরজি বলেছিলেন, আমার প্যারালাইসিস তো আর সারলো না তালুকদার সাহেব! উমাশংকরবাবু আমাদের আসার উদ্দেশ্য খোলসা করে বলতেই গজাধরজি সরাসরি চলে গেছিলেন মান্দালয় জেলের স্মৃতিচারণে। বলেছিলেন, একসময় ভারত থেকে আসা বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রাসাদের যেখানে জেলখানা ছিল, এমনকী নেতাজিকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেসব দেখাতে তিনিই নিয়ে যেতেন। আজ তো সেই জেলখানার কোনও চিহ্নই নেই। প্রাসাদের কোন অংশে জেলখানা ছিল এই নিয়ে আমার কৌতূহলের শেষ ছিল না। সেদিন গজাধরজির কথায় জানতে পেরেছিলাম, রাজবাড়ির পশ্চিমদিকে ছিল সেই কুখ্যাত জেলখানা। তারপর বলেছিলেন, সে তো ছিল নেতাজির রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা। পরে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে আবার এলেন এই মান্দালয়ে, তখন ঘোষণা হয়েছিল, ভারতীয় মাত্রেই জয় হিন্দ বলতে হবে। ফৌজের সেনারাও এব্যাপারে কড়া নজরদারি করত। জয় হিন্দের জায়গায় নমস্কার কিংবা সালাম আলেইকুম বললেই পড়ত লাঠির বাড়ি। ঠিক তিনদিনের মধ্যে মান্দালয়ের সমস্ত ভারতবাসী জয় হিন্দ বলা শুরু করেছিল।

২১

গজাধর রাইয়ের বাড়ি থেকে বেরতেই চারদিক অন্ধকার করে ধুলোর ঝড় উঠেছিল। ইরাবতীর ধারের রাস্তা ছেড়ে দ্রুত একটা গলির রাস্তা ধরেছিল আমাদের স্কুটি। সেই মুহূর্তে, উমাশংকরবাবুর পিছনে বসে আমার মনে পড়েছিল এমন ধুলোর ঝড়ের কথা তরুণ সুভাষও লিখেছিলেন মান্দালয় জেলে বসে। ঝড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে সুভাষ লিখেছিলেন, এক চলমান চাঁদোয়ার মতো ধুলো আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। গ্রিক পুরাণে ধুলিময় আধো অন্ধকারে বাস করা এক জনজাতি সিমেরিয়ানদের কথা বলা আছে। ঝড়ের মান্দালয় তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিল মিলটনের কবিতার সেই সিমেরিয়ান অন্ধকারের কথা। ঝড়ে ছত্রভঙ্গ মান্দালয়ের বাজারের রাস্তায়

সেদিন ‘সিমেরিয়ান ডার্কনেস’ নেমে আসেনি, তাই কিছুটা ভাগ্য এবং বাকিটা উমাশংকরবাবুর স্কুটি চালানোর দক্ষতায়, নির্বিঘ্নে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য জয়হিন্দ রাইয়ের বাড়ি। পাড়ায় ঢোকার পথেই চোখে পড়েছিল বিষ্ণুমন্দির। উমাশংকরবাবু বলেছিলেন, মণিপুরী ব্রাহ্মণদের পাড়া এটা। মান্দালয় যখন বর্মার রাজধানী ছিল সেই সময় থেকেই এদের এখানে বাস। নিচু দরমার বেড়া ঘেরা একটা বাড়ির সামনে স্কুটি থেমেছিল। টিনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখা হয়েছিল হীরালাল রাইয়ের সঙ্গে। ছোট উঠোনের একপাশে তুলসী মঞ্চ, মন্দির, অন্যদিকে নিজেদের দরমার বাড়ি। ঝড়ের দাপট কমে গিয়ে একটা গা জুড়নো ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। হীরালালজির স্ত্রী উঠোনেই দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে বসতে দিয়েছিলেন। গ্লাসে শরবত নিয়ে হাজির হয়েছিল বাড়ির ছোট মেয়ে। উমাশংকরবাবু বলেছিলেন, ইনি হলেন জয়হিন্দবাবুর ছেলে হীরালাল। জয়হিন্দবাবু ছিলেন আজাদ হিন্দের একজন সৈনিক। বাকি প্রশ্ন আপনি হীরালালকেই করতে পারেন।

ঠাকুরদার কথা হচ্ছে শুনেই একছুটে ঘরের ভিতর থেকে একটা পুরনো অ্যালবাম বার করে এনেছিল হীরালালজির কন্যা। সাবধানে অ্যালবামের ভঙ্গুর পাতা উলটাচ্ছিলাম। হলদেটে হয়ে দেখা দিচ্ছিল রাই পরিবারের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি। একটা ছবি আসতেই হীরালালজি বলেছিলেন, ইনিই আমার বাবা। আসল নাম ছিল রাম অবধ রাই। তিনপুরুষ আগে আমরা গোরখপুর থেকে বর্মা এসেছিলাম। আমার জন্ম এখানেই, ১৯৫২ সালে। মায়ের কাছে শুনেছিলাম যে যুদ্ধের সময় বাবা মান্দালয় ক্যাম্পেই ফৌজে ভরতি হয়েছিলেন। ট্রেনিং-এর জন্য প্রথমে রেঙ্গুন এবং পরে সম্ভবত সিঙ্গাপুরেও একবার গিয়েছিলেন। ফৌজের সঙ্গে মেইকটিলা, পোপা, এমনকী মণিপুরের যুদ্ধেও ছিলেন। মণিপুর থেকে যুদ্ধে হেরে ফিরে আসার পর বাবাদের ব্যাটালিয়ন রেঙ্গুনে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অনেকের মতো বাবারও জেল হয়। এক বছর পর বাবা মুক্তি পান এবং সেই থেকেই পাকাপাকিভাবে আমরা মান্দালয়ে বাস করছি। বাবাকে দেখেছি আজীবন তাঁর ফৌজের উর্দি যত্ন করে রাখতে। মান্দালয়ে ভারতীয়দের কোনও অনুষ্ঠানমাত্রেই বাবা সেই উর্দি পরে যেতেন। সেই থেকেই বাবাকে এখানে সবাই ‘জয়হিন্দবাবু’ বলে ডাকা শুরু করে। যুদ্ধের দিনগুলো নিয়ে বাবার লেখা একটা চটি বইও ছিল। তবে বাড়িবদলের সময় ওই বই আর বাবার ফৌজের সব কাগজপত্র কোথায় যে হারিয়ে গেল কে জানে! বর্মা স্বাধীন হবার পরেও বাবা রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। বার্মিজ ইন্ডিয়ান কংগ্রেস নামে একটা পার্টিও সেসময় তৈরি হয়েছিল। তবে ১৯৪৭-এ জেনারেল আউং সান এবং তাঁর ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের হত্যার পর এইসব রাজনৈতিক দল একে একে মুছে যায়। হীরালালজি এবং তাঁর পরিবারকে বিদায় জানিয়ে আমরা ফিরে এসেছিলাম উমাশংকরবাবুর দোকানে। ভাবছিলাম, মান্দালয়ে আসার পর কিছুটা ঘটনাচক্রে এবং বাকিটা আমার খোঁজের পদ্ধতি আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সুরেশ ভরদ্বাজ এবং উমাশংকর তালুকদারের মতো উপকারী মানুষদের সঙ্গে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক আগন্তুককে এক হারিয়ে যাওয়া সময়ের খোঁজ দিতে এঁরা দু’জনেই নিজেদের কাজ ফেলে, কেন জানি না খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

শেষবারের মতো দু’জনকে ধন্যবাদ এবং বিদায় জানিয়ে আমি চলে এসেছিলাম ইরাবতী নদীর পাড়ে মিঙ্গুন জেটিতে। ভাগ্যক্রমে তখনই একটি লঞ্চ ছাড়ছিল, টিকিট কেটে উঠে পড়েছিলাম সাত-পাঁচ না ভেবেই। লঞ্চটি যাচ্ছিল মান্দালয়ের উত্তরে, ইরাবতীর ১১ কিলোমিটার উজানে মিঙ্গুন নামের একটা গ্রামে। সাগাইং জেলার একটা গ্রাম মিঙ্গুনে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ থাকায় লঞ্চে টুরিস্টের ভিড়ও ছিল। আমার আগ্রহ ছিল ইরাবতী

নদী এবং তার দু'পাশের গ্রাম এবং বালির প্রান্তর দেখার। কারণ, যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের মণিপুর এবং কোহিমার দিকে অগ্রসর এবং শেষ পর্বে পশ্চাদপসরণ, এই দুই সময়েই মান্দালয় লাগোয়া ইরাবতীর নদীর দু'পাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যুযুধান দু'পক্ষের কাছে। জাপানি এবং ভারতীয় সেনারা মূলত মান্দালয়ের দক্ষিণদিক থেকে ইরাবতী পার হত। আর জেনারেল স্লিমের ব্রিটিশ সেনা এই মিঙ্গুন, তথা উত্তরদিক থেকে ইরাবতী নদী পার হয়ে আক্রমণ হেনেছিল মান্দালয় পুনর্দখলের চেষ্টায়।

২২

ইরাবতীর উজানে একঘণ্টা লঞ্চে যাবার পর নদীর পশ্চিম পাড়ে দেখা দিয়েছিল মিঙ্গুন। বালির চরে কাঠের পাটাতন ফেলতেই খালি হয়েছিল লঞ্চ। সারেং জানিয়েছিলেন, দু'ঘণ্টা পর এই লঞ্চ আবার ফেরত যাবে মান্দালয়। গায়ে ট্যাক্সি লেখা গোরুর গাড়ির সারি এসে দাঁড়িয়েছিল নদীর পাড়ে। টুরিস্টরা কেউ হেঁটে, কেউ গোরুর গাড়ি চেপে বৌদ্ধস্তূপ দেখতে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বালির চরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটার পর এক বিশাল তেঁতুলগাছের ছায়ায় বসেছিলাম। আশেপাশের পলাশ গাছগুলোয় আগুনের ছোঁয়া লেগেছিল। কয়েকজন দেখছিলাম মাটিতে পড়ে থাকা পলাশ কুড়িয়ে একটা ঝুড়িতে বোঝাই করছেন। কাছে গিয়ে দেখেছিলাম, ফুলের পাপড়ি ফেলে দিয়ে বাকি অংশ রাখা হচ্ছে। ওদেরই একজন একগাল হেসে বলেছিলেন, এর থেকে ওষুধ তৈরি হবে মান্দালয়ে। ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন বাকি ছিল। আমি ভাবছিলাম, ঠিক পঁচাত্তর বছর আগে, মান্দালয় সংলগ্ন এই ইরাবতীর দু'কূল জুড়েই চলছিল এক সাজোসাজো রব।

১৯৪৪-এর ১০ ফেব্রুয়ারি, মেইমিওতে জেনারেল মুতাগুচির সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে শাহনওয়াজ খান চলে এসেছিলেন মান্দালয়। ততদিনে আজাদ হিন্দের আরও দুটি ব্যাটালিয়ন পৌঁছে গিয়েছিল সেখানে। সীমান্তে যাবার আগে, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪, কালেওয়ার কাছে মুতাইক গ্রামে জাপানি 'ইউমি' অর্থাৎ 'হোয়াইট টাইগার' ডিভিশনের কমান্ডারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল শাহনওয়াজ খানের। জাপানি কম্যান্ডার শাহনওয়াজকে বলেছিলেন প্রায় ৩০০০ 'চিন' গেরিলাদের ব্যবহার করে ব্রিটিশ সেনা জাপানিদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই 'চিন' গেরিলাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জনৈক ব্রিটিশ অফিসার মেজর ম্যানিং। গেরিলা যুদ্ধে মেজর ম্যানিং-এর বেশ নামডাক ছিল। ফালাম ক্যাম্পে জাপানিদের ৬০০জন এবং হাকায় ২০০জন সৈনিক ছিল। জাপানি কম্যান্ডারের মতে এদের পক্ষে ব্রিটিশদের বেশিদিন আটকে রাখা অসম্ভব ছিল। হাকা-ফালাম অঞ্চল কোনওমতেই শত্রুপক্ষের হাতে চলে যেতে দেওয়া যাবে না জেনেই কয়েকদিনের মধ্যে জাপানিদের সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পাহাড়ি সীমান্তের দায়িত্ব নিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর গেরিলা রেজিমেন্ট। একমাসের মধ্যে চিন গেরিলাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল তারা। শাহনওয়াজ খানের নির্দেশে ৮০জন জওয়ানকে নিয়ে লেফটেন্যান্ট সিকান্দার খান এক দুঃসাহসিক অপারেশনে চিন গেরিলাদের কম্যান্ডারকে অ্যামবুশ করে ধরে ফেলেছিলেন। মেজর ম্যানিং কোনওমতে সেই অ্যামবুশ কাটিয়ে পালাতে পেরেছিলেন। সিকান্দার খান এবং তাঁর কোম্পানি শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সীমান্ত পার করিয়ে তবে শান্ত হয়েছিলেন। সিকান্দার খানের এই দুঃসাহসিক আক্রমণ এবং যুদ্ধের

পদ্ধতিতে ব্রিটিশ এবং কাচিন গেরিলারা এতটাই ভয় পেয়েছিল যে দীর্ঘদিন আর হাকা-ফালাম-তিদিম অঞ্চলে ঢোকার সাহস করেনি। এই ঘটনার একমাসের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের আজাদ এবং গাঁধী ব্রিগেড অগ্রসর হয়েছিল ইম্ফলের দিকে, আর শাহনওয়াজ খানের ১ নম্বর রেজিমেন্ট এগিয়েছিল কোহিমার দিকে।

বিকেলের মুখে আমার লঞ্চ ফিরেছিল মান্দালয়। লঞ্চের ডেকে বসে অন্য এক দুশ্চিন্তা দানা বাঁধছিল আমার মনে। চিন্তাটা জন্ম নিয়েছিল অবশ্য জিয়াওয়াদি ছাড়ার পর থেকেই। স্থানীয় খবরে পড়েছিলাম, আরাকান আর্মির মোকাবিলায় যৌথ অপারেশনে নামছে মিয়ানমার এবং ভারতীয় সেনা। এক সময় যে কাচিন গেরিলাদের ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ, আজ তাদেরই মদত দিচ্ছে চিন। ঘটনাচক্রে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল আবার সেই হাকা-ফালাম-তিদিম এলাকা জুড়েই। ফলে ভারত-মিয়ানমারের সমস্ত ল্যান্ড বর্ডার থাকছে বন্ধ। প্রমাদ গুনেছিলাম মনে মনে। মনে রাখতে হবে, যে সময় আমি এই দোটানায় ভুগছিলাম পুলওয়ামার ঘটনা তার ঠিক বারোদিন আগেই ঘটে গেছে। ইয়াঙ্গনের ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করেও সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। আমার টামু-মোরের পথে ভারতে প্রবেশের পরিকল্পনা শুনে দূতাবাসের জনৈক অফিসার জানিয়েছিলেন মিয়ানমারের দিক থেকে ভারতে ঢুকতে গিয়ে এর আগে কয়েকজন নাকি বিফল হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, দূতাবাসের এই বাণী মনে ভরসা জোগায়নি। সরাসরি যোগাযোগ করেছিলাম পূর্বপরিচিত ইন্ডিয়ান আর্মির এক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে। অফিসার অভয় দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিদিম হয়ে মিজোরাম-মিয়ানমার সীমান্ত বন্ধ, তবে টামু হয়ে মণিপুরে ঢোকার রাস্তা খোলা রয়েছে। সঙ্গে এও বলেছিলেন যে, সেনা অপারেশন যখন চলছে তখন তা কতদূর ছড়িয়ে পড়তে পারে তা এখনই বলা কঠিন। তাই সীমান্ত পেরনোয় আর বিলম্ব না করাই ভাল। মান্দালয় থেকে টামু যাবার পথে কালেওয়ায় এক-দু’দিন থাকার আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল সরাসরি টামু-র পথ ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। শুনেছিলাম, মান্দালয় থেকে সরাসরি টামু যাবার একটা বাস সার্ভিস সম্প্রতি চালু হয়েছে। লঞ্চ থেকে নেমে সরাসরি গিয়েছিলাম সেই বাস কোম্পানির অফিসে। শেষ তিনটি টিকিট পড়েছিল পরদিনের। কেটে নিয়েছিলাম পত্রপাঠ।

২৩

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯। শেষবারের মতো মান্দালয়ের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানোর পর আমার আস্তানা থেকে ব্যাগবস্তা নিয়ে হাঁটা শুরু করেছিলাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে। গত কয়েকদিনে কতবার যে ঘুরপাক খেয়েছি এই শহরে তার ইয়ত্তা নেই। শেষদিন তাই খুব চেনা মনে হচ্ছিল প্রাচীন এই শহরকে। পিনিয়া স্ট্রিট ছাড়িয়ে ই-ওয়ান মোটেলের সামনে গিয়ে দেখি বাস দাঁড়িয়ে আছে, এমনকী যাত্রীরাও সবাই বসে পড়েছে, এখন কেবল মালপত্র বোঝাইয়ের পালা। টিকিটে লেখা সময় মেনেই বাস ছেড়ে দিয়েছিল। অমরাপুরা পার হয়ে ইনওয়ার কাছে পার হয়েছিলাম ইরাবতী নদীর দীর্ঘ সেতু। ইরাবতী জুড়ে অলসভাবে ভেসে থাকা অগণিত নৌকা, বজরা, আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিল কিপলিং-এর ‘মান্দালয়’ কবিতার ‘ওল্ড ফ্লোটিলা’-গুলোর কথা। সেই মুহূর্তে, প্রায় দেড়শো বছর আগে লেখা এক কবিতার মধ্যে জাতিবিদ্বেষ, ঔপনিবেশিক দম্ভ ইত্যাদির বিশ্লেষণগুলো অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। কারণ, সেতু পার হতেই এক অপার্থিব আলোয় দেখা দিয়েছিল

সাগাইং। অস্তমিত সূর্যের আভা সোনা ঢেলে দিয়েছিল সাগাইং শহরের বৌদ্ধস্তূপগুলির মাথায়। সন্ধের মুখে বাস থেমেছিল টাজে নামের ছোট এক শহরে, আর অনেক রাতে এসেছিল কালেওয়া।

বাস থামতে ঘুম জড়ানো চোখে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়িয়েছিলাম। সহযাত্রী সবাই ঢুকে পড়েছিল রাস্তার ধারের খাবার দোকানে। দোকানের সামনে খদ্দের টানার জন্য সাজিয়ে রাখা ছিল সেদিনের স্পেশ্যাল আইটেম। কাছে গিয়ে দেখেছিলাম চারটে বড় বাটিতে সাজিয়ে রাখা আছে মুরগির ঠ্যাং, কাঁকড়া, চিংড়ি এবং বোলতা। সবক'টাই ছাঁকা তেলে ভাজা। একে মিয়ানমারে শেষ রাত, তায় আঠারো ঘণ্টার বাসজার্নি। তাই খাবার নিয়ে আর অ্যাডভেঞ্চারের ঝুঁকি নিইনি। বাস এবার উত্তরমুখী হয়ে টামুর রাস্তা ধরেছিল। পাকা রাস্তা বিদায় নিয়েছিল কালেওয়ার পর থেকেই, তাই গাড়ির গতিও হয়েছিল মন্থর। জানলা দিয়ে অন্ধকার পাহাড় আর তার গায়ে টিমটিমে আলো-জ্বলা গ্রাম দেখা ছাড়া কাজ ছিল না। মনে পড়ছিল, এই পথেই ঘটে-যাওয়া যুদ্ধের শেষ দিনগুলোর কথা। কালাদান উপত্যকা, আরাকান পাহাড়ে সুভাষ ব্রিগেডের অধীন মেজর রাতুরির দলের সাফল্য এবং সিকান্দার খানের হাতে কাচিন গেরিলাদের পর্যুদস্ত হবার পর জাপানিদের মনে আজাদ হিন্দ সেনাদের সম্বন্ধে একটা সমীহ জন্মেছিল। এই সময় গাঁধী ব্রিগেডের জওয়ানেরা এসে পৌঁছেছিল কালেওয়া। ডিভিশনাল কম্যান্ডার জামান কিয়ানি স্বয়ং ফৌজের সঙ্গে ছিলেন এবং সেই ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁরই আত্মীয় কর্নেল আই জে কিয়ানি। ইম্ফলের যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। তাই দ্রুত এগোনোর জন্য গাঁধী ব্রিগেডের সৈন্যদের নির্দেশ ছিল সঙ্গে একটি রাইফেল, পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি এবং একটি কম্বল মাত্র রাখা যাবে। মেশিনগান, হ্যান্ডগ্রেনেড, ট্রেঞ্চ কাটার যন্ত্রপাতি কিছুই সঙ্গে রাখা যাবে না। এক আদর্শ গেরিলা রেজিমেন্টের মতোই তারা ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়েছিল টামু-পালেল রাস্তা ধরে। একে একে পালেল এয়ারোড্রোম এবং উপাও গিরিশিরা আজাদ হিন্দের দখলে চলে এসেছিল।

পালেল এয়ারোড্রোম দখলের একটি ঘটনা আমার মনে সবথেকে বেশি দাগ কেটেছিল। এয়ারোড্রোম ঘিরে ব্রিটিশ সেনাদের অজস্র পিকেট ছিল। সবক'টা পিকেটেই মেশিনগান বসানো ছিল। গাঁধী ব্রিগেডের গভীর রাতের নিঃশব্দ গেরিলা অপারেশনে একের পর এক ব্রিটিশ পিকেট হচ্ছিল ধরাশায়ী। এরকম একটি পিকেটকে আমাদের সৈন্যরা আচমকা ঘিরে ফেলতেই হিন্দি ভাষায় কাতর আর্তনাদ ভেসে এসেছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির সেই সৈনিকেরা বলেছিল, সাথি হামকো মত মারো। নেতাজির আদেশ ছিল শত্রুপক্ষের সৈন্য ভারতীয় হলে তাকে প্রাণে মারা যাবে না। একমাত্র আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালানো যেতে পারে। শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করছে ভেবে কাছে যেতেই সেই ভারতীয় সৈনিকেরাই গুলি চালাতে আরম্ভ করেছিল। সবার আগে ছিলেন লেফটেন্যান্ট লাল সিং, তাঁর হাতে ছিল একটি নাগা বর্শা। মেশিনগানের গুলিতে শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও সেই বর্শা দিয়ে দু'জন মেশিনগান চালককে মেরে তবে নিজের শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন লাল সিং। সেই রাতেই এয়ারোড্রোমে ঢুকে সবক'টা ব্রিটিশ প্লেন ধ্বংস করে দিয়েছিল গাঁধী ব্রিগেড। গাঁধী ব্রিগেডের সেনাদের বেশিরভাগই ছিল মালয়েশিয়াতে ফৌজে ভরতি হওয়া তামিল। সম্মুখ সমরে এই ছিল তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। সাহসিকতা এবং যুদ্ধে পারদর্শিতায় তারা ব্রিটিশদের মস্তিষ্কপ্রসূত মার্শাল এবং নন-মার্শাল জাতির তত্ত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

ভোরের আলো ফুটতেই বাসের জানলায় দেখা দিয়েছিল চিন্ডুইন নদী আর পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পৌঁছে গেছিলাম টামু। বাস থেকে নেমে সময় নষ্ট না

করে হাঁটা দিয়েছিলাম ভারত সীমান্তের দিকে। সকালের মিঠে রোদে ছিমছাম টামুর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে মন্দ লাগছিল না। অদূরে দেখা দিয়েছিল স্বদেশের পাহাড় এবং মিয়ানমারের সীমান্ত চেকপোস্ট।

মণিপুর এবং উপসংহার

১

সীমান্ত চেকপোস্ট ফাঁকা ছিল। একজন ভারতীয় তার নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে দেখে অফিসাররা কোনও প্রশ্নই করেননি। তবে এই টামু-মোরে সীমান্ত মিয়ানমারের দিক থেকে হেঁটে পার হবার ব্যাপারে যেহেতু ইয়াঙ্গনের ভারতীয় দূতাবাস আমাকে কোনও আশ্বাস দেননি, তাই শেষ পর্যন্ত একটা চাপা উত্তেজনা ছিলই। একটা ডিপার্চার ফর্ম লিখে জমা দিতেই আমার দেশনায়কের পথে চলার মিয়ানমার পর্ব শেষ হয়েছিল। পোস্ট থেকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছিল একটি সংকীর্ণ পাহাড়ি নদীর ওপর। ছোট আর্মি ব্রিজ পার হতেই পা রেখেছিলাম ভারতের মাটিতে। বাঁদিকে টিলার ওপর দেখা যাচ্ছিল ভারতের তোরণ। তোরণ পার হয়ে একেবারে টিলার মাথায় ভারতের ইমিগ্রেশন অফিস। ইমিগ্রেশনের পর কাস্টমস বিভাগে যেতেই সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত অফিসার মানিকবাবু। বলেছিলেন, আমার বাড়ি ত্রিপুরা, অনেকদিন পর একজন বাঙালি পেলাম এখানে। আপনাকে চা না খাইয়ে ছাড়ছি না। আরে, যাবেন তো আজ ইম্ফল। একটু বসুন গল্প করি। মানিকবাবুর একাকিত্ব বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বসার উপায় কিংবা ইচ্ছা ছিল না। সিঙ্গাপুর থেকে যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, আজ চল্লিশ দিন পর তা ছিল শেষের মুখে। তাই, একটু ব্যস্ত হচ্ছিলাম। মানিকবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক কিলোমিটার হেঁটে চলে এসেছিলাম মোরে গ্রামের সীমান্তে। ইম্ফলগামী শেয়ার ট্যাক্সিতে জায়গা পেতে একটুও সময় লাগেনি। রাস্তায় অগণিতবার থামতে হয়েছিল মিলিটারি চেকপোস্টগুলিতে। বিকেলে পৌঁছে গিয়েছিলাম ইম্ফল।

পরদিন সকালে উঠে প্রথম কাজ ছিল মোইরাং যাওয়া। ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল, আজাদ হিন্দের বাহাদুর গ্রুপের কর্নেল হাবিব মালিক যেখানে ভারতের পতাকা তুলেছিলেন, আজ সেখানে বিরাট মিউজিয়াম। স্থানীয় মানুষ চিংসুবাম চাওবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। চাওবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আধ কিলোমিটার দূরে এক ভাঙাচোরা টিনের চালের বাড়িতে। জানতে পেরেছিলাম, তিনমাসের জন্য এই বাড়িটি ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিস। দেওয়াল এবং টিনের চালে বুলেটের গর্ত নিয়ে অবিকল সেইরকমই আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটি। বাড়িটি রক্ষা করে চলেছেন হেমাম নরেন সিং এবং তাঁর স্ত্রী রাসেশ্বরী দেবী। রাসেশ্বরী দেবী বলেছিলেন, শ্বশুরমশাই নীলমণি সিং নিজের অর্থে এই বাড়ি বানিয়ে দান করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে। নীলমণি নিজেও ভরতি হয়েছিলেন ফৌজে। মণিপুর থেকে রিট্রিটের সময় ফৌজের সঙ্গে চলে গেছিলেন রেঙ্গুন। আজও প্রতি বছর ২১ অক্টোবর, নেতাজির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ এবং আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষণার দিন পালিত হয় এখানে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিধায়ক-মন্ত্রী কেউ না কেউ আসেনই। তবে আজ অবধি, আমাদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও এই বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের ভার কোনও সরকারি দফতরই নিতে চাননি। আর কতদিন এই ঐতিহাসিক বাড়ি আমরা নিজেদের খরচায় বাঁচিয়ে রাখতে পারব তা জানি না।

আগেও বহু সাংবাদিক এবং নেতা ইত্যাদির সঙ্গে এই কথা হয়েছে এবং কোনও ফল হয়নি, তাই একরকম অভিমান নিয়েই বাড়ির দাওয়ার এককোণে চুপ করে বসেছিলেন, নীলমণিবাবুর পুত্র নরেন সিং। রাসেশ্বরী দেবীকে বিদায় জানিয়ে আমি ইম্ফল ফেরার পথ ধরেছিলাম।

মনে হয়েছিল, মিয়ানমার, তাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, পররাষ্ট্র। তবু, এইসব দেশে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ সম্পর্কিত বাড়িঘর এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের কোনওটা আজ ভগ্নদশায়, কোনওটা আবার রয়েছে রক্ষিত। সিঙ্গাপুর সরকার ইতিহাস-সচেতন তাই স্বাভাবিকভাবেই হেরিটেজ রক্ষায় তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। মালয়েশিয়াও সম্প্রতি তাদের হেরিটেজ বাড়িগুলি রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে। দীর্ঘ রাজতন্ত্রের ইতিহাসের জন্যই সম্ভবত তাইল্যান্ডে মিলিটারি শাসকদের মধ্যেও কম-বেশি হেরিটেজের মূল্য রয়েছে। অর্ধ শতাব্দী জুড়ে মিলিটারি শাসনের পরেও মিয়ানমারের তরুণ প্রজন্মও সম্প্রতি ইয়াঙ্গনের কলোনিয়াল স্থাপত্য রক্ষার পক্ষে সওয়াল করছে। তাই স্বদেশের মাটিতে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দের ঐতিহ্য জড়ানো এমন একটি অমূল্য সম্পদের প্রতি সরকারি ঔদাসীন্য দেখার পর আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম এ হল ইতিহাস মুছে ফেলার একধরনের প্রাচীন রাজকৌশল। যে কৌশল প্রচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে ছিল এবং আজও রয়েছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে স্বনামধন্য ঐতিহাসিকদের বেস্টসেলিং বইপত্রে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রামচন্দ্র গুহ-র *মেকার্স অফ মডার্ন ইন্ডিয়া*-র মতো বইতে আরএসএস-এর 'গুরুজি' গোলওয়ালকর জায়গা পেলেও নেতাজি পাননি এবং বিপন চন্দ্রর মতো সম্মানিত ঐতিহাসিকের লেখা এবং সম্পাদিত *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস* নামের ৬০০ পাতার বইতে মাত্র দেড়পাতা জায়গা পেয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। দশকের পর দশক ধরে, বহু ঐতিহাসিক সত্যের 'অমিশন' এবং 'সাপ্রেশন'ই আজকের মূলস্রোতের গণমাধ্যম এবং তার স্টেরয়েড অবতার 'সোশ্যাল মিডিয়া' জুড়ে এক মিথ্যার বেসাতির আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। ফলে, নেতাজির কাজ, দেশগঠনের পরিকল্পনা নিয়ে চর্চা না করে মানুষ আজ মনোরঞ্জন খুঁজছে ভিত্তিহীন গসিপে।

২

২৮ ফেব্রুয়ারি, মোইরাং দেখে সরাসরি ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে কলকাতার প্লেনে বসেছিলাম। সময়মতোই টেক-অফ করেছিল বিমান। ইম্ফলের সবুজ পাহাড়ি উপত্যকা একটু একটু করে ছোট হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল মেঘের স্তরের নীচে। আমার মনে হয়েছিল এই তো সেদিন কলকাতা থেকে উঠেছিলাম সিঙ্গাপুরের বিমানে। সেদিন কোনও ধারণা ছিল না সিঙ্গাপুর থেকে মণিপুর চলার পথে কী ধরনের অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষায় রয়েছে! পুরোটাই ছিল একরকম অ্যাডভেঞ্চার। তাই, যাত্রা শুরু হবার পর, যখনই পৌঁছেছিলাম নেতাজি কিংবা আজাদ হিন্দের স্মৃতিবিজড়িত কোনও স্থানে, মন রোমাঞ্চিত হয়েছিল আবিষ্কারের আনন্দে। যখনই দেখা হয়েছিল বালক সেনা, বালিকা সেনা এবং কোনও প্রাক্তন সৈনিকের সঙ্গে যিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ আমি নেতাজিকে দেখেছি, আমি নিজের কানে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি— তাঁদের শরীর স্পর্শ করে আমার মনে হয়েছিল আমিও যেন নেতাজির স্পর্শ পেয়েছি। সেদিন বিমানে বসে অনেকটা ফ্ল্যাশব্যাকের মতো মনে পড়েছিল কিছু ঘটনা এবং কিছু মানুষকে। বিশেষ করে মনে হয়েছিল মিয়ানমারের অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করা

প্রাক্তন যোদ্ধা কালিপ্রসাদজি, শান্তিলালজি এবং ক্যাপ্টেন শর্মার মতো মানুষের কথা। আজও যুদ্ধের সেই দিনগুলির স্মৃতিমাত্র সম্বল করে বেঁচে আছেন তাঁরা। জীবনের শেষ দিনগুলিতে পৌঁছে গিয়েও প্রাপ্তির ঝুলি শূন্য তাঁদের। সম্মান, স্বীকৃতি দূরে থাক— না হতে পেরেছেন মিয়ানমারের নাগরিক, না ভারতের। অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চরম উদ্দীপনাময় অধ্যায়ের কুশীলব ছিলেন তাঁরাই। আজাদ হিন্দের প্রাক্তন সেনানীদের নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি কেবল ভোটব্যাংক দেখেছে। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে, কেবল ভারতের শেষ স্বাধীনতার যোদ্ধারা নন, যথার্থ স্বীকৃতি এবং মূল্যায়ন পায়নি আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধনীতি, কৌশল, সাহসিকতা এবং সাফল্যও।

মণিপুর-কোহিমায় যুদ্ধ যেমন আরম্ভ হয়নি, তেমন শেষও হয়নি। রেঙ্গুনের কিছুটা উত্তরদিকে টাউঙ্গু থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ফৌজকে মেইকটিলা, পোপা, মনিওয়া, কালেওয়া— এইসব শহরে একের পর এক যুদ্ধে হারাতে হারাতে মণিপুর এবং কোহিমা অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল আজাদ হিন্দ এবং জাপানের সৈন্যদল। হ্যাঁ, ইম্ফল আক্রমণ এবং দখলের সেই শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে তাদের কাছে যথেষ্ট খাবার এবং অস্ত্র ছিল না। কিন্তু তার অর্থ কখনই এই নয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজ এক অপরিণত, অর্ধপ্রস্তুত সেনাদল ছিল। ১৯৪৪ সালের ১৮ জুলাই মহম্মদ জামান কিয়ানি 'রিট্রিট' ঘোষণা করেছিলেন মণিপুর-কোহিমা সীমান্ত থেকে। ইম্ফল আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধ সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। মনে রাখতে হবে রিট্রিট ঘোষণার ঠিক একমাস আগেই দু'লক্ষ তিরিশ হাজার নতুন ভলান্টিয়ার যোগ দিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজে। এই যোগদান এসেছিল কেবল মালয়েশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই। ১৯৪৫ সালের ১০ জানুয়ারি, নেতাজি রেঙ্গুন থেকে আবার নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। জানুয়ারি মাস শেষ হবার আগেই আরও দুটি নতুন রেজিমেন্ট মালয়েশিয়া থেকে বর্মায় এসে পৌঁছেছিল। এরপর আরও পাঁচমাস ভয়ংকর যুদ্ধ চলেছিল গোটা বর্মা জুড়ে। ১৯৪৫ সালের ৬ এবং ৯ আগস্ট আমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলেছিল হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে। ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করার পর বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধের সব আশা শেষ হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ সেনার মূল অফিসারদের গ্রেফতার করে দিল্লি এনে পাবলিক ট্রায়াল শুরু করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তারা ভেবেছিল, তাদের প্রোপাগান্ডা প্রসূত 'জাপানি দালাল'-দের সর্বসমক্ষে কঠিন শাস্তি দিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে একটা ভীতি এবং সম্ভ্রম আদায় করা যাবে। কিন্তু এই ঘটনায় ভারতের শাপে বর হয়েছিল। দেশের জনগণ সেই প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের খবর বিশদে জানতে পেরেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের দেশপ্রেম, একতা, আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার কথা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্লোগান উঠেছিল — লাল কিলা সে উঠি আওয়াজ/ সেহগাল-ধিলন-শাহনওয়াজ। প্রেমকুমার সেহগাল, গুরবক্স সিং ধিলন এবং শাহনওয়াজ খানের অন্যতম ডিফেন্স কাউন্সিল ভুলাভাই দেশাই প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিষয় এই তিনজন অফিসারের কোর্ট মার্শালের নয়, বিষয় হল ভারতবাসী হিসেবে এঁদের 'right to wage war' আছে কি না? তিনমাসের মধ্যেই, ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন বম্বে এবং করাচিতে নৌ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল আর্মি এবং এয়ার ফোর্সের মধ্যেও। অনুপস্থিত থেকেও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাই লিখে গেছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো পরাজিত এক সৈন্যদল যে এত প্রভাব ফেলতে পারে তা বিশ্বের ইতিহাসে অন্য কোথাও দেখা যায়নি।

বিশ্বের ইতিহাসে নেতাজি সেই বিরলতম মানুষদের একজন, যাঁর কাজের নিশ্চয়তার সঙ্গে মননের প্রত্যয়ের, বাস্তবে কোনও তফাত করা যায় না। তাঁর যৌবনের নিবেদিত দেশপ্রেম, তরুণ বয়সের সর্বভারতীয় আন্দোলন সংগঠন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান, স্বাধীন দেশগঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং শেষপর্যন্ত সম্মুখ সমরে এক অসমসাহসিক নেতৃত্ব প্রদান; তাঁকে এমন এক অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল যে, আজ চাইলেই সেই মহাজীবনের ক্যানভাসের খণ্ডচিত্রে খুঁজে পাওয়া সম্ভব একটুকরো সাইমন বলিভার, লিওন ট্রটস্কি, নেলসন ম্যান্ডেলা, লর্ড বায়রন, জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গাঁধী, এমনকী, চে গুয়েভারাকেও। আজ স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পর ভারতবর্ষ জুড়ে এমন কোনও শহর বা গ্রামাঞ্চল নেই যেখানে অন্তত একটা স্কুল, কলেজ, ক্লাব, রাস্তা, স্টেশন, লাইব্রেরি, স্ট্যাচু কিংবা সরোবরের সঙ্গে 'নেতাজি' কিংবা 'আজাদ হিন্দ' কিংবা 'জয় হিন্দ' জড়িয়ে নেই! অথচ, তার অর্থ কি এই যে নেতাজির ভাবধারায় গোটা দেশ আজ উদ্বুদ্ধ? গোটা দেশ নেতাজিময়তায় আপ্লুত? সাইনবোর্ডে যাই লেখা থাক, আপনি এবং আমি, দু'জনেই জানি যে, যে-কোনও জিনিসের বহুল ব্যবহারে যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এক, নেতাজিকে নিয়ে এক বা একাধিক স্টিরিয়োটাইপ তৈরি হয়েছে। দুই, গোটা ব্যাপারটা ভাসাভাসা এবং অর্থহীন হয়ে গেছে। প্রথম বিষয়, স্টিরিয়োটাইপ, মানে একটা 'সিংগল স্টোরি'-র বিপদ। মেক্সিকান মানেই ইললিগাল ইমিগ্রান্ট, মুসলমান মানেই উগ্রপন্থী, বৌদ্ধ মানেই অহিংস— এই ধরনের স্টিরিয়োটাইপ। আর এটা থেকেই জন্ম নিয়েছে দ্বিতীয় বিষয়— 'নেতাজি', 'আজাদ হিন্দ', 'জয় হিন্দ', এইসব শব্দগুলোর পটভূমিকা, প্রকৃত অর্থ, প্রয়োগ, তাৎপর্য এবং আজকের দিনে প্রাসঙ্গিকতা— সব হারিয়ে গেছে। এই ঘটনাটি, আমার মনে হয় এক ধরনের সামাজিক 'semantic satiation'।

বাড়ি ফিরে আসার কয়েকদিন পর, ঐতিহাসিক নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তর সাহায্যে কলকাতার নেতাজি ভবনে দেখা হয়েছিল শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু এবং অধ্যাপক সুগত বসুর সঙ্গে। শ্রীমতী বসুর লেখা *চরণরেখা তব* এবং অধ্যাপক বসুর *হিজ ম্যাজেস্টিস অপোনেন্ট* আমার যাত্রাপথ পরিকল্পনার মূল স্তম্ভ ছিল। দু'জনেই এত খোলা মনে এবং আন্তরিক কৌতূহলের সঙ্গে আমার কথা শুনেছিলেন যে আমার মন ভরে গিয়েছিল। যাত্রাপথে যা কিছু দেখেছিলাম, প্রাক্তন যোদ্ধাদের মুখে শুনেছিলাম এবং উপলব্ধি করেছিলাম তা নেতাজির বাড়িতে বসে তাঁরই বংশধরদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারার মধ্যে এক ধরনের সম্পূর্ণতা ছিল। মনে হয়েছিল দেশনায়কের পথে চলার এই হল যোগ্য যবনিকা।

নির্দেশিকা

‘Starvation amidst Plenty: The Making of Famine in Honan, Bengal and Tonkin, 1942-1945’


দেশনায়কের পথে • অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়



|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

